السيف المكشوف على من شتم الرسول ﷺ

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে
কটাক্ষ,কটুক্তি,গালিগালাজ বা ব্যঙ্গ প্রদর্শনকারী মালউনদের
ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান-

উন্মুক্ত তলোয়ার

রাগিব আল-আতহার

السيف المكشوف على من شتم الرسولﷺ

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কটাক্ষ,কটুক্তি,গালিগালাজ বা ব্যঙ্গ প্রদর্শনকারী মালউনদের ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান-

উন্মুক্ত তলোয়ার

•••

রাগিব আল-আতহার

পূর্ব কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة و التسليم، أما بعد

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি- আমাদের ইলাহ এক, তিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নাই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও মনোনিত রাসুল। তিনি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল। তারপর আর কোন নবী বা রাসুল আসবে না।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবই নন বরং তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল। মহান আল্লাহ তাআলার পর তাঁর মর্যাদার আসন। তাঁর আগমন এই বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত। কোন মানুষ নিজের জান-মাল, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক তাঁকে ভালবাসা ছাড়া মুমিন হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন: “নবী [সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা তুল্য”। (সুরা আহযাব:৬)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন: “তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পিতা-মাতা, এবং সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ থেকে আমাকে বেশি মোহাব্বত করবে। (সহীহ বুখারী:১৫,সহীহ মুসলিম:১৭৭)

সুতরাং, মুমিন মাত্রই নিজের জান প্রাণ থেকেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বেশী ভালোবাসে। শুধু মুসলিম কেন অমুসলিমরা পর্যন্ত তাঁর আদর্শে মুগ্ধ। তাঁকে স্থান দিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আসনে। তবে তাদের কথা ভিন্ন যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে, এবং সত্যকে গ্রহণ করার মত সৎ-সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তাই কোন প্রকৃত ঈমানদার যখন শুনতে পায় যে, কোন নামধারি মুসলমান অথবা কোন কাফের প্রিয় নবী কে গালমন্দ করছে, অথবা কেউ তাকে কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ করেছে, তখন তাঁর ঈমানি চেতনা জেগে উঠে এবং তার ধর্মীয় আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত হানে। নবীর এই দুশমনের উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পায় না। আর স্বস্তি না পাওয়াই কাম্য। কারণ নবীর মর্যাদায় আঘাত হানার অর্থ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আক্রান্ত করা। একজন মুসলমান তার ধর্মীয় অনুভূতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।এবং সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাই কোন মুমিনের জন্য এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ বরদাস্ত করা সম্ভবপর হয় না।

অপর দিকে বর্তমান সেকুলার রাষ্ট্রগুলোও এসকল কুলাঙ্গারদেরকে কোনপ্রকার শাস্তি প্রদান থেকে সম্পুর্ণ বিরত থাকে, যা মুমিন হৃদয়ে উদ্বেলিত অগ্নিশিখার প্রজ্জলনকে আরও বাড়িয়ে তুলে। সুতরাং যারা এমন জঘন্য কাজে (গালি,কটুক্তি/কটাক্ষ) লিপ্ত হবে, কুরআন- হাদীস ও ইজমার আলোকে- ইসলামী শরীয়তে তাদের কী শাস্তির বিধান রয়েছে তা আলোচনার দাবি রাখে। এই গুরুত্বপুর্ণ (যা বর্তমানে অবহেলিত) শরয়ী বিধান নিয়েই আমাদের কলম ধরা। পরিশেষে মহান রবের নিকট আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা এই যে, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কুবল করে নেন এবং তার হাবীব সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তরকে পুর্ণ করে দেন। আমীন।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

১. রিদ্দাহ এর সংজ্ঞা ও পরিচয়।.....০৭

২. রিদ্দাহ এর প্রকারভেদ।.....০৯

৩. রিদ্দাতুল ই'তিকাদ।.....১০

৪. রিদ্দতুল আকওয়াল।..... ১১

৫. রিদ্দাতুল আফআল। ১৩

৬. মুরতাদ এর ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান।.....১৩

৭. হাদীসে নববীতে মুরতাদের শাস্তি-প্রসঙ্গ।.....১৪

৮. সাহাবাগণ কর্তৃক মুরতাদ হত্যার নজির.....১৬

৯. মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে উম্মতের ইজমা.....১৮

১০.কটাক্ষ/কটুক্তি রিদ্দাহ এর জগন্যতম প্রকার.....২০

১১.ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য.....২১

১২.রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ভালোবাসা
ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত।..... ২৩

২য় অধ্যায়

১৩.কটুক্তি/কটাক্ষ বলতে কি বুঝায়?..... ২৫
১৪.কটুক্তিকারীর ব্যপারে শরীয়তের বিধান।..... ২৬
১৫.পবিত্র কুরআনে শাতেমের শাস্তি-প্রসঙ্গ।..... ২৬
১৬.হাদীসে নববীতে শাতেমের শাস্তি-প্রসঙ্গ।..... ৩০
১৭.নববী যুগে শাতেম হত্যার আরও কিছু নজীর।..... ৩৯
১৮.শাতেমর শাস্তি প্রসঙ্গে উম্মতের ইজমা।..... ৪২
১৯.শাতেম হত্যা প্রসঙ্গে শরয়ী কিয়াস
থেকে দলিল।..... ৪৬

৩য় অধ্যায়

২০.মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর তওবা।..... ৪৭
২১.মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব।..... ৪৭
২২.শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব।..... ৪৯
২৩.আল্লামা শামীর চূড়ান্ত বক্তব্য।..... ৫২

৪র্থ অধ্যায়

২৪.শাতেম যদি যিম্মি হয় তার বিধান।..... ৫৩
২৫.শাতেমকে নিজ উদ্যোগে হত্যা করার
বিধান।..... ৫৪
২৬.আমাদের শেষ বার্তা।..... ৫৭

৫ম অধ্যায়

২৭.নবীজি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য.....৫৮
২৮.নবীজি সম্পর্কে অমুসলিম স্কলারদের বক্তব্য।..... ৬২
২৯.সিরাতে রাসূল [নবী জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র].....৬৫
৩০.শামায়েলে রাসুল [নবী চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ]..... ৮২

প্রথম অধ্যায়

রিদ্দাহ এর সংজ্ঞা ও পরিচয়

মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। মানুষের জন্য তিনি এই দ্বীন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ-ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন বা ধর্ম মানুষের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করবেন না।এবং উক্ত দ্বীন গ্রহনের পর তা থেকে ফিরে যাওয়া হলো সবচেয়ে জগন্যতম অপরাধ। এব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া,আখিরাত উভয় জগতেই কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

রিদ্দাহ এর আভিধানিক অর্থ

الردة এর শাব্দিক অর্থ হলো: الرجوع عن الشيئ অর্থাৎ কোন জিনিষ থেকে ফিরে আসা। এর থেকেই নেওয়া হয়েছে الردة عن الإ سلام তথা ইসলাম থেকে ফিরে আসা। (আল-জামহারাহ:১/৭২)

রিদ্দাহ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. হানাফি মাযহাবের ইমাম আল্লামা সমরকন্দি (রহ.) বলেন, রিদ্দাহ বলা হয়- ঈমান গ্রহনের পর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করাকে। (তুহফাতুল ফুকাহা:৭/১৩৪)

২. মালেকী মাযহাবের ইমাম আল্লামা আলীশ (রহ.) বলেন: রিদ্দাহ হলো- কোন মুসলিম স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা কুফরি করা, অথবা এমন শব্দ দ্বারা যা কুফরের তাকাযা করে, অথবা এমন কাজ দ্বারা যা কুফরকে শামিল রাখে। (মানহুল জালিল: ৪/৪৬১)

৩. শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম আল্লামা কালয়ুবী (রহ.) বলেন, রিদ্দাহ হলো- ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এটা হতে পারে কুফর করার দ্বারা, কোন কুফরি কথা বা কোন কুফরি কাজ দ্বারা। চাই সে এটা ঠাট্টা স্বরূপ বলুক, অথবা একঘেয়েমি-বশত বলুক, অথবা দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বলুক। (কালয়ুবী ও আমীরাহ: ৪১৭৪)

৪. হাম্বলি মাযহাবের ইমাম আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন: মুরতাদ হলো ঐ ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে কুফরের দিকে ফিরে গিয়েছে।(আল মুগনী:৮/৫৪০)

বক্তব্যগুলোর মুল ইবারত নিম্নরূপ:

قد عرفها السمرقندي من الأحناف بقوله: الردة عبارة عن الرجوع عن الايمان. وعرفها عليش من المالكية بقوله: الردة كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه. وعرفها قليوبي الشافعي: هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً. وعرفهاوعرف إبن قدامة الحنبلي: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام ألى الكفر. وقال الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي في كتابه بعد ذكر هذه الا قوال: والتعريف المختار هو ما عرفه قليوبي الشافعي، لأنه شمل الردة بانواعها من اعتقاد وقول وفعل، ولأنه أفصح عن الاستهزاء والعناد والاعتقاد. (أحكام المرتد: ٣٩)

মোট কথা: ঈমান বিনষ্টকারী যে কোনো কুফরী-শিরকী আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করা, অথবা এ জাতীয় কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত হওয়ার নামই হল 'ইরতিদাদ' বা মুরতাদ হওয়া। আদালতে রিদ্দাহ প্রমাণিত হবার পর তার উপর মুরতাদের শাস্তি-বিধান জারী করা হবে।

রিদ্দাহ এর প্রকারভেদ

মৌলিক ভাবে "দ্বীন ত্যাগ" তিন ভাবেই হতে পারে। বিশ্বাস পোষন দ্বারা, উক্তির দ্বারা, এবং কর্মের দ্বারা। উক্ত বিবেচনায় রিদ্দাহ তিন প্রকার। (১)রিদ্দাতুল ই'তিকাদ-বিশ্বাস পোষন দ্বারা দীন ত্যাগ (২)রিদ্দাতুল আকওয়াল- উক্তি দ্বারা দীন ত্যাগ (৩)রিদ্দাতুল আফআল - কর্মের দ্বারা দীন ত্যাগ। নিচে প্রকারগুলোর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো:

• রিদ্দাতুল ই'তিকাদ

১. যদি কেও মহান আল্লাহর সাথে শিরক করে, অথবা তাকে অস্বিকার করে, কিংবা তার জন্য সাব্যস্ত কোন সিফাতকে বুঝেশুনে অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহর জন্য এমন বিষয়কে সাব্যস্ত করে যা আল্লাহ অস্বিকার করেছেন (যেমন, তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা।) অথবা এমন জিনিসকে অস্বীকার করে যা, আল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন, (যেমন: পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম।) তাহলে উক্ত ব্যাক্তি কাফের হয়ে যাবে। এব্যপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত। [ইবনে আবেদিন:৪/২২৩, আল-মুগনী:৮/৫৬৫, আল-ইকানা:৪/২৯৭, আল ইনসাফ:১০/৩২৬]

২. কুরআন আল্লাহর কিতাব। এটা আমাদের নিকট সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক সূত্রে পৌছেছে। এতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং কেউ যদি পুর্ণ কুরআন অথবা তার কিছু অংশকে বিশ্বাস না করে, অস্বিকার করে, সে কাফের হয়ে যায়। [আল ইনসাফ:১০/৩২৬, আল ইকনা:৪/২৯৭, ফাতওয়ায়ে সুবকি: ২/৫৭৭]

৩. যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ (সা:) যা কিছু নিয়ে এসেছে তার কিছু কিছু মিথ্যা, অথবা সে সর্বসম্মত কোন হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস পোষন করে, (যেমন, মদ্যপান, যিনা ইত্যাদি।) উক্ত ব্যাক্তি কাফের হয়ে যায়। [ইবনে আবেদিন:৪/২২৩, শরহুল আযহার লি-আবি মিফতাহ:৪/৫৭৫]

• রিদ্দতুল আকওয়াল

১. যে ব্যক্তি দীনের মুতাওয়াতির, অকাট্য, সুস্পষ্ট- ওয়াজিব, হারাম বা এজাতীয় অন্য কোন বিধান কে অস্বিকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। [শরহুল আকায়েদ:৩৫৫, শরহে ফিকহুল আকবার:১৩৮, আশ-শিফা:২/১০৭৩,মাজমুউল ফাতাওয়া:১২/৪৯৭, রওযাতুত তালেবীন:২/১৪৬]

২. কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেয়, তাহলে সে জগন্যতম কাফের হয়ে যাবে। এব্যাপারে ফুকাহয়ে কেরামের বক্তব্য অভিন্ন। [মুসতাদরিকুল ওসায়েল:৩/৩৪৭]

(ক) কতিপয় ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো, তাকে হত্যা করা হবে। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের। [আল-ফুরু':২/১৬০, আসসাইফুল মাশহুর:পৃ.২]

(খ) হানাফী ওলামাদের বক্তব্য হলো আল্লাহকে গালিদাতা যদি তওবা করে, তার তওবা গৃহীত হবে। [ইবনে আবেদিন:৪/২৩২,আসসাইফুল মাশহুর:৪]

৩. কেও যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কটাক্ষ/কটুক্তি কিংবা গালিগালাজ করে, অথবা তার সম্মান খাটো করে, তাহলে উক্ত ব্যাক্তি গুরুতর কাফের হয়ে যাবে। এব্যাপারে উম্মাতের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। [ইবনে আবেদিন:৪/২৩২, ২৩৩,২৩৪,২৩৫,২৩৭, ফাতওয়ায়ে সুবকি:২/৫৭৩, আস সারিমুল মাসলুল:৪, আসসাইফুল মসালুল:৪, আল মহাল্লা:১১/৫০০, মুসতাদরিকুল ওসায়েল:৩/২৪৩]

লক্ষণীয়: আকিদাগত রিদ্দাহ যখন মুখ দ্বারা প্রকাশ পাবে তখন এটা রিদ্দাতুল আকওয়াল এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি সে তা অন্তরে গোপন করে রাখে, এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে তাহলে সে মুনাফিক। তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, যতক্ষন না তার রিদ্দাহ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

• রিদ্দাতুল আফআল

১. কোন ব্যক্তি যদি এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত বা উপাসনা করবে, চাই তা যে প্রকারেরই ইবাদাত হোক না কেন (যেমন, রুকু, সিজদাহ, মান্নত, দোয়া ইত্যাদি) সে কাফের হয়ে যাবে। [তাইসীরুল আযীযীল হামীদ:১৯৪, আদ-দুরারুন নাদ্বীদ ফি ইখলাসি কালিমাতিত তাওহিদ:২০-২১]

২. কেউ যদি আল্লাহর নাযিলকৃত কোন অকাট্য বিধানকে প্রত্যাখান করে, হালালকে হারাম বা হারাম কে হালাল করে, অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহকে রহিত করে নিজেরাই সংবিধান প্রণয়ন করে, সর্বসম্মতি ক্রমে সে কাফের। [আহ্কামুল কুরআন:৩/১৮১, তাফসীর ইবনে কাসীর: ৩/১৩১, আত-তামহীদ:৪/২২৬, মাজমূয়ুল ফাতওয়া:৩/২৬৭]

৩. ঈমান ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কেউ যদি কাফেরদের পক্ষপাতীত্ব করে, তাদেরকে শক্তি ও সমর্থন যুগিয়ে সহায়তা করে- সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের হয়ে যাবে। [মাআ'রেফে মাদানী:অধ্যায়-কতলে মুসলমান, আল-ফাতাওয়াল কুবরা:৪/৩৩২, কালিমাতু হক্ব: পৃষ্ঠা:১২৬-১৩৭, আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান: ১/৮৪]

বি দ্র: অনেকে রিদ্দাহ এর চতুর্থ আরেকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। তা হলো, রিদ্দাতুত তরক (কোন আমল বর্জন বা পরিত্যাগ করার দারা দীন ত্যাগ)

"যে ব্যাক্তি জেনে-শুনে শরীয়তে নির্ধারিত ঈবাদাত সমুহ, বিশেষ করে সলাত কে তার ফরযিয়াত অস্বীকার করার সাথে ছেড়ে দিবে, সে কাফির হয়ে যাবে। সে যদি এবিষয়ে অজ্ঞাত থাকে (যেমন নতুন ইসলাম গ্রহণ কারী) তাহলে তার উপর কুফরের হুকুম প্রয়োগ হবেনা। বরং তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে, এবং তা ওয়াজিব হওয়ার দলিল পেশ করা হবে। এরপরও যদি সে তাতে অটল থাকে তাহলে কাফের এর বিধান প্রয়োগ হবে। [রিসালাতু বদরুর রশীদ,পৃ:৮, ইবনে আবেদীন:১/৩৫২, উমদাতুল কারী:২৪/৮১, আল মুগনী:৮/৫৪৭,আল-ইনসাফ:১/১০৪,]

এটাতো সুস্পষ্টই যে, কোন ইবাদাতকে অস্বিকারের সাথে বর্জন করার দারা কুফর আরুপিত হবে। কিন্তু সলাতের বিষয়টি একটু ব্যাতিক্রম। এক্ষেত্রে অনেক ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো "কেউ যদি অলসতাবশত ইচ্ছাকৃত সলাত বর্জন করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে তার ফরজিয়ত কে অস্বিকার না করে।" আবার অনেকে এটাকে কুফরের হুকুম দেন না। বরং কবিরাহ গুনাহে শামিল করেন।এবং ইচ্ছাকৃত সলাত বর্জনকারীকে গুরুতর ফাসেক মনে করেন। হানিফী ওলামায়ে কেরামের রায় এটাই। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। উলামায়ে কেরামের পারস্পরিক ইখতেলাফও অনেক। তাই বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত করলাম।

মুরতাদ এর ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান

মুরতাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো মৃত্যুদণ্ড। তবে সে যদি তওবা করে, এবং দ্বীনে ফিরে আসে তাহলে তার তওবা গৃহীত হবে এবং মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে। (আদালতে রিদ্দাহ প্রমানিত হলে) বিচারকের জন্য নিয়ম (মুস্তাহাব) হলো, মুরতাদকে প্রথমে তওবা করার সুযোগ দিবে, এবং তার কোন সংশয় থাকলে তা দূর করবে। অতপর সে তওবা করলে ভালো। অন্যথায় নির্ধারিত শাস্তি (মৃত্যুদন্ড) প্রয়োগ করবে।

হাদীসে নববীতে মুরতাদের শাস্তি-প্রসঙ্গ

"হাদিস" ইসলামী শরীয়তের স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল এবং কুরআনের তাফসীর। নিচে সহীহ হাদিসের আলোকে মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

এক.

عن عكرمة قال : أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه

হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে ধর্মত্যাগীদের উপস্থিত করা হল, তখন তিনি তাদের পুড়িয়ে ফেললেন। এ সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, যদি আমি হতাম তাহলে আমি তাদের পুড়িয়ে ফেলতাম না। রাসূল (সাঃ) এর এ নিষেধাজ্ঞার কারণে যে, "তোমরা আল্লাহর শাস্তি দিয়ে শাস্তি দিওনা"। বরং আমি তাদের হত্যা করতাম। কারণ আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন-"যে ব্যক্তি ধর্ম পাল্টায় তাকে হত্যা কর"। [সহীহ বুখারী:৬৫২১, সহীহ ইবনে হিব্বান:৫৬০৬, সুনানে আবু দাউদ:৪৩৫৩]

দুই.

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল–তিন কারণের কোনো একটি ব্যতীত তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয় : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করা, ইসলাম ত্যাগ করে উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। [সহীহ বুখারী: ৬৮৭৮, জামে তিরমিযী:১৪০২]

তিন.

قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إس لامه أو النفس بالنفس

হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, তুমি কি জান না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিবাহিত জিনাকারী, অথবা মুসলমান হওয়ার পর কুফুরীকারী অথবা হত্যার কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েজ নয়। [সুনানে নাসায়ী:৩৪৮০, মুসনাদুল বাজ্জার:৩১৫৩]

চার.

عن عائشة قالت : ارتدت أمرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধে এক মহিলা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাকে তওবা করানো হোক! আর যদি তওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। [সুনানে দারা কুতনী:১২১, সুনানে বায়হাকী কুবরা:১৬৬৪৫]

পাচ.

عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن : الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উম্মে মারওয়ান নামের এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন তার কাছে ইসলাম পেশ করতে, অতপর যদি সে ফিরে আসে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। [সুনানে বায়হাকী কুবরা:১৬৬৪৩, সুনানে দারা কুতনী:১২২]

সাহাবাগণ কর্তৃক মুরতাদ হত্যার নজির

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালাগাল বা মন্দ বললে লোকটি মুরতাদ হয়ে যায়। ইসলামী শরীয়তে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সাহাবাগণ কর্তৃক কতিপয় মুরতাদ হত্যার নজীর ও আছার নিচে উদ্ধৃত করা হল-

এক.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর ইয়ামেন ও নজদে মুরতাদ হওয়ার ফিতনা প্রবল আকার ধারণ করে। অনেক লোক মুসায়লামা কাজ্জাব ও সাজ্জাহের নবুওয়ত মেনে মুরতাদ হয়ে

যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইরতিদাদের এ ফিতনারোধে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন। হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহাল (রাঃ) কে সেখানে পাঠানোর সময় নসীহত করলেন যে, ومن لقيته من المرتدة إلى عمان واليمن حضرموت فنكل به তথা "আম্মান থেকে হাজরামাওত এবং ইয়ামান পর্যন্ত যত মুরতাদ পাবে সবক'টিকে হত্যা করবে"। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/৩৬৩]

দুই.

عن سعيد بن عبد العزيز: أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উম্মে কিরফাকে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে হত্যা করেন। [সুনানে দারা কুতনী:১১০, সুনানে বায়হাকী কুবরা:১৬৬৪৯]

তিন.

كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر حتى فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام فكتب إليه عمر أن اقبل منه الإسلام ما قبل الله منهم اعرض عليه الإسلام فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه"

হযরত আমর বিন আস (রাঃ) ওমর (রাঃ) এর কাছে লিখে পাঠালেন যে, এক লোক ইসলাম গ্রহণ করে আবার কাফের হয়েছে, তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারপর আবার কাফের হয়েছে, এভাবে সে কয়েকবার করেছে, তার ইসলাম কি কবুল করা হবে? তখন হযরত ওমর (রাঃ) লিখলেন যে, যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা তার ইসলাম গ্রহণ করেন, তুমিও তার ইসলামকে গ্রহণযোগ্য মানো, তুমি তার সামনে ইসলাম পেশ কর, যদি গ্রহণ করে তাহলে ছেড়ে দাও,

নতুবা হত্যা কর। [কানযুল উম্মাল:১৪৬৭]

চার.

أن عثمان بن عفان كان يقول: من كفر بعد إيمانه طائعا فإنه يقتل

হযরত উসমান (রাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর ইচ্ছেকৃত কুফরী করে, তাকে হত্যা করা হবে। [কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-১৪৭০]

পাচ.

عن الشعبي عامر بن شراحيل: قال عليٌ رضيَ اللّٰه ُ عنهُ: يُستتابُ المرتدُ ثلاثًا فإن عاد قُتِل

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মুরতাদকে তাওবা করতে তিনবার বলা হবে, তওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে। [কানযুল উম্মাল:১৪৭৫, সুনানে বায়হাকী কুবরা: ৮/২০৭]

মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে উম্মতের ইজমা

মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড-এর উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে। (কোনো দ্বীনী বিষয়ে যুগের মুজতাহিদ আলেমগনের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে ইজমা বলে।এটি শরীয়তের তৃতীয় স্তরের দলিল) এখানে এবিষয়ে ইজমার কিছু দলিল তুলে ধরা হচ্ছে:

১. আল্লাম ইবনে আব্দিল বার রহ. (৪৬৩ হি.) বলেন:

إن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك

অর্থাৎ যে তার দ্বীন ত্যাগ করে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে এবং তার শিরচ্ছেদ করা হবে। মুরতাদের এ শাস্তির বিষয়ে পুরো উম্মতের সুপ্রতিষ্ঠিত ইজমা তথা মতৈক্য রয়েছে। [আত-তামহীদ: ৫/৩০৬]

২. ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. (৬২০ হি.) বলেন:

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. وروي ذلك عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد وغيرهم، ولم ينكر على ذلك. فكان إجماعا.

অর্থাৎ সব ধরনের মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা মতৈক্য রয়েছে। হযরত আবু বকর, উসমান, আলী, মুআয, আবু মুসা, ইবনে আব্বাস এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ প্রমুখ সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ শাস্তির উপর কোনো সাহাবী আপত্তি করেননি। অতএব মৃত্যুদন্ডের এ বিধানের উপর সাহাবায়ে কেরামেরও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। [আলমুগনী: ১২/২৬৪]

এ বিষয়ে আরও যারা ইজমা নকল করেছেন, তাদের কয়েকজন যথাক্রমে:

১. ইবনুল মুনযির (মৃত্যু ৩১৮ হি:)–আলইজমা পৃ. ১২২। ২. ইবনে হাযম যাহেরী (মৃত্যু ৪৫৬ হি:)–মারাতিবুল ইজমা পৃ. ২১০। ৩. ইবনে রুশদ আলহাফীদ মালেকী (মৃত্যু ৫৯৫ হি:)–বিদায়াতুল মুজতাহিদ

২/৩৪৩। ৪. ইবনে কুদামা মাকদিসী হাম্বলী (মৃত্যু ৬৮২ হি:)–আশশরহুল কাবীর ৫/৩৫৫। ৫. বুরহানুদ্দীন আলহানাফী (মৃত্যু ৬১৬ হি:)–আলমুহীতুল বুরহানী ৭/৪৪৩। ৬. ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (মৃত্যু ৯৭৪ হি:)–আলই'লাম বি কাওয়াতি-ইল ইসলাম পৃ. ৪০০। ৭. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আসসানআনী (মৃত্যু ১১৮২ হি:)–সুবুহুস সালাম ৩/৫৩৪। ৮. ইবনে আবেদীন শামী (মৃত্যু ১২৫২ হি:)–রাসায়েল ১/৩১৬। ৯. যফর আহমদ উসমানী (মৃত্যু ১৩৯৬ হি:)–ই'লাউস সুনান ১২ : ৫৯৯

মহানবী (সাঃ) কে গালিগালাজ বা কটাক্ষ করা রিদ্দাহ এর জগন্যতম প্রকার

এক মুনাফেক রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্রুপপূর্ণ কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنّ إِنّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

“আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (তাদের বিদ্রুপ পূর্ণ আচরণের বিষয়ে) তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলেছিলাম এবং কৌতুক করেছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে। ছলনা করনা, তোমরা কাফের হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার পর।” [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

• উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু বকর-জাযায়িরী (রহ.) বলেন:

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. أي الذي تدعونه، لأن الإستهزاء بالله والرسول والكتاب كفر مخرج من الملة

অর্থাৎ তোমরা যেই (মিথ্যা) ঈমানের দাবি করতে তারপরও তোমরা কুফরি করেছো। কেননা আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও আল্লাহর কিতাবের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফর, যা ধর্ম থেকে বাহির করে দেয়। {আয়সারুত তাফাসির}

• আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وهذا نص في أن الإستهزأ بالله وآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى

আয়াতটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করা কুফর। সুতরং গালি বা কটুক্তি আরও আগে কুফর। {আছ ছারিমুল মাসলূল: ৩৩}

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য

(১) আল্লামা ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. (২৩৮হি.) বলেন:

أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله

মুসলিমদের সর্বসম্মত মত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলকে কটূক্তি করে বা আল্লাহর অবতীর্ণ কোনো বিধানকে

প্রত্যাখ্যান করে অথবা কোনো নবীকে হত্যা করে, তা হলে সে কাফের; যদিও সে আল্লাহর অবতীর্ণ অন্য সকল বিধানকে স্বীকার করে। {ইবনে আবদিল বার- আল ইসতিযকার:২/১৫০}

(২) আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. (৬৮১হি.) বলেন:

كل من أبغض رسول الله بقلبه كان مرتدا، فالسب بطريق أولى وإن سب سكران أن لا يعفى عنه

যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অপছন্দ/বিরাগ পোষন করবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি তাকে গালি দেয় সে তো আরও কঠিন ভাবে মুরতাদ। আর যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গালি দেয় তাকেও ক্ষমা করা হবে না। {ফাতহুল কাদীর: ৪/৪০৭}

(৩) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (১৩৫২হি.) রহ. ইকফারুল মুলহিদিন গ্রন্থে লিখেছেন:

أيما رجل مسلم سب رسول الله ﷺ ، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى، وبانت منه امرأته."كتاب الخراج". أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر، ومن شك في عذابه وكفره كفر. " الشفاء "، وغيره

“যে কোন মুসলমান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালি দেয়, অথবা তাকে অস্বিকার বা তার নিন্দা করে, কিংবা তার মর্যাদা খাটো করে সে কাফের {কিতাবুল খারাজ} “সমস্ত মুসলিম -ফুকাহাগণ- ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নবী (সাঃ) এর কটুক্তিকারী কাফের। যে তার শাস্তি ও কুফরির ব্যপারে সন্দেহ পোষণ করবে সেও কাফের। {আশ-শিফা}

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ভালোবাসা ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত

একজন মুসলমানের কাছে রাসূল সাঃ নিজের প্রাণের চেয়ে, নিজের সন্তানের চেয়ে, নিজের মা-বাবার চেয়ে এবং তার যাবতীয় সম্পদ থেকে প্রিয়। যদি কোন ব্যক্তির এমন মোহাব্বত না থাকে, তাহলে লোকটি মুমিনই নয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পিতা-মাতা, এবং তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে আমাকে বেশি মোহাব্বত করবে। [সহীহ বুখারী:১৫, সহীহ মুসলিম:১৭৭]

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে ভালোবাসা ঈমানের প্রাণ। এবং এটা আল্লাহকে ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর ভালোবাসার উপর অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তুর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিবে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

বল, ‘তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্য ত্যাগি সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’ [সূরা তওবাহ:২৪]

• সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারেনা, যতক্ষন না অন্য সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসা তার অন্তরে অধিক বদ্ধমূল হয়ে যায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

عن عَبْد اللهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لأَ نْتَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ كُلّ شَىْءٍ إِلا ّ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لا َ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنّهُ الآنَ وَاللهِ لأَ نْتَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الآنَ يَا عُمَرُ " .

আবদুল্লাহ ইব্নু হিশাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর হাত ধরেছিলেন। ‘উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে অন্য সব কিছু চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নবীজি (সাঃ) বললেন, না, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষন না আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এখন আপনি আমার কাছে আমার

প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবীজি (সাঃ) বললেন, হে উমর! এখন (তুমি সত্যিকার ইমানদার হলে)। [সহিহ বুখারী:৬৬৩২]

২য় অধ্যায়

কটুক্তি/কটাক্ষ বলতে কি বুঝায়

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) 'আছ ছারিমুল মাছলুল আলা শাতেমির রসূল' কিতাবে নবীজী (সা.)এর শানে কটাক্ষের বিবরণ ও মাত্রা সম্পর্কে কাজী ইয়ায থেকে নকল করেন, তিনি বলেন, কটাক্ষ বলতে বুঝায়: মহানবী (সা.)কে গাল মন্দ করা, তাঁর দোষ চর্চা করা, ব্যঙ্গ চিত্র করা, তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তাঁর মহান আদর্শময় জীবনের কোন দিক নিয়ে বিদ্রুপ করা, তাঁর বংশ নিয়ে সমালোচনা করা। তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে তাঁর আনিত ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, তাঁর প্রতি লানত ও বদ দুআ করা, তাঁর অমঙ্গল কামনা করা, তাঁর সাথে বেআদবি করা, তাঁর শানে অশালীন কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি সবই কটাক্ষ হিসেবে বিবেচিত।

কটুক্তিকারীর ব্যপারে শরীয়তের বিধান

কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি এবং মুজতাহিদ ইমামদের ইজমা বা সর্বসম্মত মতানুসারে এ কথা প্রমানিত যে, রাসূল সাঃ কে গালমন্দকারী, কুৎসাকারী এবং মুরতাদের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চারও মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটাই। সুতরাং, যদি কোন নামধারি মুসলমান প্রিয় নবী সাঃ কে গালিগালাজ,কটাক্ষ,কটুক্তি বা বিদ্রুপ করে, তাহলে সে উম্মাহর ঐক্যমতে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। গালিদাতা চাই মুরতাদ হোক কিংবা আসলী কাফের হোক, তার একমাত্র সাজা মৃত্যুদন্ড। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা মুসলিম শাসকের উপর কর্তব্য।

পবিত্র কুরআনে শাতেমের শাস্তি-প্রসঙ্গ

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে কুফ্ফার লিডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা এমন লোক যাদের কোনই চুক্তি নেই। সম্ভবতঃ তারা বিরত হবে। [সূরা তওবাহ:১২]

• উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৫৬হি:) বলেন,

استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر... وقال ابن المنذر : أجـمـع عــامــة أهـل الـعـلـم على أن مـن سـب الـنـبي صلى الله عليه وسلم ، عـلـيـه القتل

এই আয়াত দারা কতিপয় আলেমগণ দলিল পেশ করেছেন, যে ব্যাক্তিই দীনের ব্যাপারে কটুক্তি করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব, কেননা সে কাফের হয়ে গেছে। ইবনুল মুনযির বলেছেন: যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)কে গালি দিবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ সিদ্ধান্তের উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। {তাফসিরে কুরতুবী}

• আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি:) বলেন,

وَمِنْ هَاهُنَا أُخِذَ قَتْلُ مَنْ سَبّ الرّسُولَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، أَوْ مَنْ طَعَنَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذَكَرَهُ بِتَنَقّصٍ؛

যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালি দেবে বা দ্বীনে ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করবে কিংবা তাঁর মর্যাদা খাটো করে উল্লেখ করবে– তাকে হত্যা করার দলিল এই আয়াত থেকে গৃহীত। {তাফসিরে ইবনে কাসীর}

• আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. (৯১১হি:) বলেন,

قالَ السُّيُوطِيُّ (في الإكْلِيلِ): اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ مَن قالَ إنَّ الذِّمِّيَّ يُقْتَلُ إذا طَعَنَ في الإسْلامِ أوِ القُرْآنِ أوْ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِسُوءٍ، سَواءٌ شَرَطَ انْتِقاضَ العَهْدِ بِهِ أمْ لا،

একদল ওলামায়ে কেরাম এই আয়াতের দ্বারা দলিল দিয়ে বলেন- যদি কোন যিম্মি ব্যাক্তিও ইসলাম বা কুরআনের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্য করে, অথবা রাসূল (সাঃ) এর ব্যাপারে মন্দ কথা বলে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। {মাহাসিনুত তায়ীল}

• আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন:

وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله، وطعن في الدين، وإن أمسك عن غيره .

যে ব্যাক্তি দ্বীন নিয়ে কটুক্তি করবে তাকে কতল করা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর এটাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ। কেননা তিনি ঐ ব্যাক্তির রক্তকে মূল্যহীন সাব্যস্ত করেছেন, যে আল্লাহ এবং তার রাসুল কে কষ্ট দিয়েছে এবং দ্বীন নিয়ে কটুক্তি করেছে। যদিও তিনি (মক্কা বিজয়ের দিন) অন্যদের হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। {আছছারিমুল মাসলুল}

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। [সূরা আহযাব: ৫৭]

• উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসির আস সাদী (রহ) বলেন:

هذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية، من سب وشتم أو تنقص له

أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى لَعَنَهُم اللهُ فِي الدّنْيَا أي: أبعدهم وطردهم، و لعنهم (في الدنيا) أنه يحتم قتل من شتم الرسول وآذاه

আয়াতটি কথা ও কর্মের- উভয় প্রকার কষ্টকেই অন্তরভুক্ত করে। যেমন, গালি দেওয়া,ভর্ৎসনা করা অথবা রাসুল (সাঃ) বা তাঁর দ্বীনের মর্যাদা খাটো করা কিংবা প্রত্যেক এমন বিষয়(কথা বা কাজ) যা তাকে কষ্ট দেয়। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে অভিসম্পাত করেছেন। আর 'দুনিয়াতে অভিসম্পাত' এর অর্থ হলো–যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালি ও কষ্ট দিবে তাকে বাধ্যতামুলক ভাবে হত্যা করা হবে। {তাফসিরে সা'দী}

• আল্লামা কাজী ইয়াজ (রহ:) বলেন:

قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد تقدم من الكتاب و السنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير، وتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، قال الله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا)

• আল্লামা কাজী ইয়াজ রহঃ বলেন, কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা রাসূল সাঃ এর শানে কি কি হক রয়েছে তা প্রমানিত। এবং তাকে কতটুকু সম্মান-ইজ্জত দিতে হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এ হিসেবে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে রাসূল সাঃ কে কষ্ট দেয়া হারাম করেছেন। আর উম্মত একথার উপর ইজমা তথা ঐক্যমত্বে পৌঁছেছেন যে, মুসলমানদের মাঝে যে তাঁর কুৎসা বলবে, কিংবা গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। (অতপর তিনি আয়াতটি উল্লেখ করেন। {আশ শিফা: ২/২১১}

• আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ) বলেন: আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, রসূল (সাঃ)কে কষ্টদাতার জন্য কঠোর শাস্তি ও জাহান্নাম অবধারিত। আর সাধারণ থেকে সাধারণ কটাক্ষও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। {রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩১৬}

নোট: আয়াতটিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সাঃ) কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপকারীর শাস্তি-বিধান আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর রাসূল (সাঃ) মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে সেই বিধানের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

হাদীসে নববীতে শাতেমের শাস্তি-প্রসঙ্গ

১. ইমাম তবারানী রহঃ আলী ইবনে আবি তালিব রাদিঃ থেকে বর্ণনা করছেন:

قال رسول اللهﷺ من سب نبيا قتل ومن سب أصحابي جُلد.
وفي رواية: من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فجلدوه

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নবীকে গালি দিবে তাকে হত্যা করো! এবং যে আমার সাথীদেরক গালী দিবে তাকে বেত্রাঘাত করো! [তবরানী-আল মু'জামুস সগীর:১/৩৯৩; কাযী ইয়ায, আশ-শিফা:২/২২০, জামেউল আহাদীস:২২৩৬৬, আহকামু আহলিয যিম্মাহ:৩/১৪৫৪,১৪৫৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, فهو دليل أنه على يدل وظاهره الأنبياء، من نبياً سب من قتل وجوب على له حـد القتل وأن استتابة، غير من يقتل

যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন নবীকে গালি দিবে তাকে হত্যা করা

আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে এই হাদিসটি দলিল। আয়াতের বাহ্যিক অর্থই প্রমাণকরে যে, শাতেমকে তওবার সূযোগ না দিয়েই হত্যা করতে হবে। {আছ-ছারিমুল মাসলুল}

তবে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হলো আব্দুল আযিয ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

২. ইমাম বুখারী রহঃ জাবির রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

عن جابر رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَنْ لِكعْبِ بْنِ الأ َشْرَفِ فَإِنّهُ قَدْ آذَى اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ نَعَمْ...... فأتاه فقتله

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বললেন, ‘কে আছ যে কা’ব ইব্‌নু আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ্ তা’আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন ‘হ্যাঁ। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর মুহাম্মাদ ইব্‌নু মাসলামাহ (রাঃ) কা’ব ইব্‌নু আশরাফের নিকট গেলেন এবং তাকে হত্যা করেন। [সহিহ বুখারী: ৩০৩১, মুসলিম:১৮০১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কা'ব ইবনে আশরাফ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিন্দা করত। ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার আহ্বান জানান।

(হত্যার পরের দিন) কা'বের জনবল নবীজির কাছে এসে বলল,

“আমাদের সরদার কা'বকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: إنه قر لو كما قر غيره ممن هو لى يفعل ولم بالشعر وهجانا الأذى منا نال ولكنه مااغتيل رأيه مثل السيف له كان إلا منكم أحد هذا

“অন্যদের মতো সেও যদি সংযত থাকত তা হলে সে ক্ষতির মুখোমুখি হত না। আমরা তার থেকে কষ্ট পেয়েছি, সে আমাদের নামে নিন্দা-কাব্য রচনা করেছে। তোমাদের কেউ যদি এমন জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তাহলে তরবারিই তার ফয়সালা করবে।” অতপর ইহুদিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কাব ইবনুল আশরাফের হত্যার পর থেক তারা পুরোপুরি সাবধান হয়ে যায়। {আছ- ছারিমুল মাসলুল}

এই হাদিসটি সুস্পষ্ট ভাবেই বলে দিচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কটাক্ষ বা গালিগালাজ করার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। কেননা রাসুল (সাঃ) নিজে এই বিধান বাস্তবায়ন করেছেন এবং ভবিষ্যতে যারা এই কাজ করবে তাদের জন্যও মৃত্যুদন্ডের ফয়সালাা শুনিয়ে দিয়েছন। “ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, ইমাম শাফী (রহ.) এই হাদিস দিয়েই দলিল পেশ করে বলেন- কোন যিম্মিও যদি রাসুল (সাঃ) কে গালি দেয় তাকে হত্যা করা হবে এবং তার নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাবে। {আছ-ছারিমুল মাসলুল}

৩. ইমাম বুখারী রহঃ বারা ইবনে আযেব রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

بعث رسول اللهﷺ إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعين عليه الخ قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আব্দুল্লাহ বিন আতিক রাদিঃ কে আমীর বানিয়ে আবু রাফে ইহুদীকে হত্যা করতে পাঠালেন। আবু রাফে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কষ্ট দিত এবং অন্যদের কষ্ট দিতে সাহায্য করত। আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি তাকে প্রচন্ড আঘাত করলাম, কিন্তু হত্যা করতে পারিনি। তারপর তরবারীর ধারালো ডগা তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম এমনকি তা তার পিঠ ফুরে বেরিয়ে যায়। তখন আমি বুঝলাম যে, আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। [সহীহ বুখারী: ৩৮১৩]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কতিপয় লোক একাজে নিয়োগ রাখা দরকার। যারা রাসূল (সাঃ) কে যারাই গালাগাল করবে, অশ্লিল মন্তব্য করে তাকে কষ্ট দিবে, তাদেরকে হত্যা করবে।

• আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহঃ বলেন,

قال الحافظ في «الفتح» في شرح قصة ابن أبي الحُقيق: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله ﷺ بيده أو ماله أو لسانه

এই হাদিসে কিছু ফাওয়ায়েদ হলো–যেই মুশরিকের কাছে দাওয়াত পৌঁছার পরও শিরকে অনড়, তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়া। এবং যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে হাত, সম্পদ বা জবান দ্বারা শত্রুকে সমর্থন-সাহায্য করবে তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়া। {ফাতহুল বারী:৭/৩৪৫}

৪. ইমাম নাসাঈ রাহঃ আনাস রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطل متعلق

بأستار الكعبة فقال اقتلوه.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিলো। তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো যে, ইবনে খতল (মৃত্যুর ভয়ে) কাবার গিলাফ জড়িয়ে আছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। [সুনানে নাসাঈ: ২৮৬৭, তিরমিজি:১৬৯৩]

ইবনে খতল প্রথমে মুসলিমই ছিল। নবীজি (সাঃ) তাকে যাকাত উত্তোলনের জন্য নিয়োগ করেন। সঙ্গে আরেকজনকে নিয়োগ দেন তার সহযোগিতার জন্য। কিন্তু সঙ্গীটি তার জন্য খাবার প্রস্তুত না করায় সে ক্ষেপে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতপর সে মৃত্যুর ভয়ে মুরতাদ হয়ে সাদাকার মাল নিয়ে পালিয়ে যায়। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কটূক্তিমূলক কবিতা রচনা করতো, সাথে তার দুই দাসীকেও আদেশ করত, তারা যেন সূর করে সেই কবিতাগুলো গায়। {ওয়াকিদি–আল-মাগাযি:২/৮০৯} ফলে তার রক্ত হালাল হওয়ার একই সাথে তিনটি কারণ একত্রিত হয়: ১.মুসলিম হত্যা করা ২.রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ ৩.নবীজিকে কটুক্তি করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও আল্লামা সুবকি (রহ.) বলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে কটুক্তিমুলক কবিতার কারণে। কেননা যদি কেসাস স্বরুপ হত্যা করা হতো তাহলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হাতো, যদি রিদ্দাহ এর কারণে হত্যা করা হতো তাহলে তাকে তওবার সূযোগ দেওয়া হতো, কিন্তু দুটির একটিও করেনি, সুতরাং হত্যার কারণ হিসেবে বাকি থাকলো- গালি বা কটুক্তি। {আছ-ছারিমুল মাসলুল, আস-সাইফুল মাসলুল}

ইবনে খতালকে কেন কাবার গিলাফ ধরা অবস্থায়ও রাসূল (সাঃ)

হত্যা করার নির্দেশ দিলেন? আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)ও বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এর কারণ হলো লোকটি রাসূল সাঃ কে গালমন্দ করত। {ফাতহুল বারী-২/২৪৮}

৫. ইমাম আবু দাউদ রহঃ হযরত আলী রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللهﷺ دمها.

এক ইয়াহুদী নারী নবী করীম (সাঃ)কে গাল-মন্দ করতো এবং তাঁর সমালোচনা করতো। একদিন এক ব্যক্তি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। তখন রাসূল (সাঃ) তার রক্তমূল্য বাতিল ঘোষণা করেন। [সুনানে আবু দাউদ:৪৩৬৪, সুনানে বায়হাকী কুবরা:১৩১৫৪]

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে বাত্তাহ রহিমাহুমাল্লাহু। ইমাম আহমদ (রহ) এই হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহন করেছেন। [খাল্লাল, আল-জামি:২/৩৪১]

• শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন,

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي ﷺ ، ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى؛ لأن هذه المرأة كـانـت مـوادعـة مـهـادنـة؛

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করার কারণে অভিশপ্ত ইয়াহুদি নারীটিকে হত্যা করার ব্যাপারে হাদীসটি একেবারেই দ্যর্থহীন। আর এই হাদীসটি আরও স্পষ্টভাবে ওই সকল যিম্মি ও মুসলিম নারী-পুরুষের রক্ত হালাল হওয়ার দলিল, যারা নবী (সাঃ) কে গালমন্দ করে। {আছ-ছারীমুল মাসলুল}

• আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি (রহ:) বলেন,

“সুতরাং, রাসুল (সাঃ) কর্তৃক মহিলার রক্তকে বৃথা সাব্যস্ত করা এবিষয়ে মজবুত দলিল যে, ‘গালি’ তার হত্যাকে আবশ্যক করেছে। এবং রাবী কর্তৃক إبطال কে شتم এর পরে فاء হরফ যুগে উল্লেখ করা এবিষয়ে দলিল যে, রক্তকে বৃথা সাব্যস্ত করার কারণ হলো গালি দেওয়া। আর রাসুল (সাঃ) কর্তৃক شتم উল্লেখ করার পরপরই রক্ত মুল্যহীন হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়াও প্রমাণ করে যে, (তাকে হত্যা করার) মুল কারণ হলো গালি। {আস সাইফুল মাসলুল: ৩৩৫}

৬. ইবনে আব্বাস রাদিঃ সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

عن عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له ام ولد تشتم النبي ﷺ ، فقتلها ، فسأله عنها، فقال: يارسول الله إنها كانت تشمك، فقال رسول الله ﷺ :ألا إن دم فلانة هَدَرٌ.

এক অন্ধ লোকের একটি উম্মে ওয়ালাদ দাসী ছিল। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করত। ফলে অন্ধ লোকটি দাসী টিকে হত্যা করে ফেলল। রাসূল (সাঃ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই দাসী আপনাকে গালমন্দ করতো। ফলে নবী (সাঃ) বললেন, শুনে রাখ! তার রক্ত বৃথা গেলো। [সুনানে আবু দাউদ:৪৩৬৩, সুনানে দারা কুতনী: ১০৩]

• আল্লামা খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وفيه بيان أن ساب النبي مقتول وذلك أن السب منها لرسول الله ارتداد عن الدين

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গালমন্দকারীকে হত্যা করা হবে। কারণ, গালমন্দ

বা অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করা মানে মুরতাদ হয়ে যাওয়া বা ইসলাম ত্যাগ করা।{খাত্তাবি, মাআালিমুস সুনান:৩/২৯৬}

• আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) বলেন, অন্ধ সাহাবীর এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবীজী (সাঃ) কে মন্দ মন্তব্যকারীকে হত্যা করে দেয়া হবে। আর মুসলমান হলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। এবং তার থেকে তওবা করার আবেদন করার দরকার নেই। {বুলুগুল মারাম ফি আহাদীসিল আহকাম-১৩৩}

ইমাম খাত্তাবি ও ইবনু হাজার রাহিমাহুমাল্লাহ-দের কথা এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, উনারা কটূক্তিকারী নারীটিকে মুসলিম ছিল বলে মনে করেন। আর পূর্বের হাদিস ইহুদি মহিলা সংক্রান্ত। সুতরাং এটি ভিন্ন ঘটনা। আবার হতে পারে এই ঘটনাটা হবহু আগের ঘটনাই। যেমনটা ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) প্রমাণ করেছেন। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার বাদীও ইহুদিই হবে।

৭. ইমাম আবু দাউদ রহঃ আবু বারযাহ আসালমি রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

أن رجلا أغلظ لأبي بكر الصديق، فقال له أبو برزة دعني أضرب عنقه، فقال ما كان ذلك لأحد بعد رسول اللهﷺ

এক লোক আবু বকর সিদ্দীক রাদিঃ এর উপর রাগ দেখালো, তখন আবু বারযাহ রাদিঃ বললেন, আমাকে অনুমতি দিন তার গর্দান উড়িয়ে দেই! তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পরে এই মর্যাদা অন্য কারও নাই। [সুনানে আবু দাউদ:৪/২৫৮:৪৩৬৫, আল-মহল্লা লিইবনে হাযম: ১১/৪০৯]

• শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেন, অনেক ওলামায়ে কেরাম শাতেমে রাসুলকে হত্যা করার ব্যাপারে এই হাদিস দ্বারা

দলিল পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- আবু দাউদ, ইসমাইল ইবনে ইসহাক আল-কাযী, আবু বকর আব্দুল আযীয, কাযী আবু ইয়া'লা সহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। {আস সারিমুল মাসলুল}

অতপর তিনি বলেন,

وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم

এই হাদীসটি থেকে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটূক্তি করবে তাকে হত্যা করা বৈধ। হাদীসটি কাফের -মুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। {আছ ছারিমুল মাসলুল}

• আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকী রহঃ বলেন: আবু বকর রাদিঃ এর এই বক্তব্যটি প্রমাণ করে যে, রাসুল সাঃ এর অধিকার রয়েছে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার, যে তার উপর রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করে। তবে অন্য কারো ক্ষেত্রে এই অধিকার নাই। আর এটা নিশ্চিত যে, তার (সাঃ) ব্যাপারে গালমন্দ করা- তাকে রাগান্বিত করে। {আস সাইফুল মাসলুল:১২৩}

৮. আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিঃ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

عن عبدالله بن عباس أنّ رجلًا منَ المشركينَ شتمَ النّبيّ ﷺ فقال النّبيُ ﷺ من يَكفيني عدوّي فقال الزُبيرُ بنُ العوّام أنا يا رسولَ اللهِ فبارزهُ فقتلَه فأعطاهُ النّبيُ ﷺ سلبَه

এক মুশরিক রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিলো। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, আমার পক্ষ থেকে আমার দুশমনের (হত্যার) জিম্মাদারি কে নিবে? তখন জুবাইয় ইবনুল

আওয়াম দাঁড়িয়ে বললেন আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রাসুলুল্লাহ! অতপর তিনি (জুবায়ের) তাকে (মুশরিককে) হত্যা করলেন।ফলে নবীজি মুশরিকের সলব (সাথে থাকা সরঞ্জামাদি তাকে দিয়ে দিলেন [মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ৫/২৩৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া:৮/৪৫]

আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে:

وروي أن رجلا ً كان شب النبي ﷺ فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد أنا. فبعثة النبي ﷺ إليه فقتله

এক লোক রসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কে গালি দিলে তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে আমার দুশমনের (হত্যার) জিম্মাদারি কে নিবে? খালিদ (রাদি:) দড়িয়ে বললেন, আমি প্রস্তুত আছি। রাসুল (সাঃ) তাকে পাঠালেন, অতপর খালিদ রাদিঃ তাকে হত্যা করেন। [মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক:৫/৩০৮]

গুস্তাখে রাসুলকে হত্যা করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে হাদিস দুটি সম্পূর্ণ দ্যর্থহীন। আল্লামা সুবকি (রহ:) বলেন, هذان الحديثان يدلان على أن السب موجب للقتل এই হাদিস দুটি প্রমাণ করে, রাসুল সাঃ কে গালি দেওয়া বা নিন্দা করা হত্যাকে আবশ্যক করে। {আসসাইফুল মাসলুল:৩৫৮}

নববী যুগে শাতেম হত্যার আরও কিছু নজীর

১– আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকী (রহ:) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যখনই কাউকে শুনতেন যে, সে নবী (সাঃ) কে গালি দেয়, তাকে হত্যা করে ফেলতেন, যদিও সে আত্নীয় হতো। এবং রাসুল (সাঃ)ও তা সমর্থন

করতেন, অস্বীকার করতেন না। বরং এতে সন্তুষ্ট হতেন। এবং অনেক সময় তাকে (رسوله و الله ناصر) 'আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্যকারী' উপাধি দিয়েছেন। {আসসাইফুল মসালুল: ৩৫৯}

২– আবু ইসহাক আল-ফারাযী মালেক ইবনে উমায়ের (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক রাসুল (সা:) এর কাছে এসে বললেন, আমি মুশরিদকরে মাঝে আমার পিতাকে দেখতে পেলাম। অতপর তার থেকে আপনার ব্যাপারে মন্দ কথা শুনলাম। ফলে আমি অধৈর্য হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছি। (فما شق ذلك عليه) এই সংবাদ রাসুল (সাঃ) এর কাছে ভারী মনে হলোনা। {আসসাইফুল মাসলুল:৩৫৯}

৩– মক্কা বিজয়ের দিন হুয়াইরিস বিন নাকীজ নামের এক কুলাঙ্গার যে রসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিকে কষ্ট দিত, তাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। {আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/২৯৮, আসাহহুস সিয়ার-২৬৪}

৪– মদীনায় আবু ইফক নামে এক কুলাঙ্গার ছিল। তার কাজই ছিলো রাসূল সাঃ সম্পর্কে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করা। বদর যুদ্ধের পর সে নবীজী (সাঃ) কে আরও হিংসা করতে লাগলো। এবং নবীজী (সাঃ) ও মুসলমানদের নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করলো। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে সালেম আমের (রা:) নামে একজন সাহাবী তাকে হত্যা করেন। {সীরাতে ইবনে হিশাম-৪/২৮৫}

৫– বনী উমাইয়্যার এক কবি মহিলা ছিল। যার নাম আসমা বিনতে মারওয়ান। সে আবু ইফকের হত্যা দেখে ইসলামকে ঠাট্টা করে কবিতা রচনা করে। তখন রাসূল সাঃ তাকে হত্যার নির্দেশ দিলে উমায়ের বিন আদল আল খাতামী রাঃ তার ঘরে গিয়ে তাকে হত্যা

করে আসেন। এ সংবাদ রাসূল সাঃ কে জানালে রাসূল সাঃ খুশি হয়ে বলেন- হে উমায়ের! তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করেছো। {সীরাতে ইবনে হিশাম-৪/২৮৬}

৬– গুরফা বিন হারেস আল কিন্দী নামের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। যার সাথে এ চুক্তি ছিল যে, তার জান-মালের হিফাজতের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের। বিনিময়ে সে ইসলামী রাষ্ট্রে কোষাগারে কর জমা দিত। ইসলামের পরিভাষায় যাকে জিম্মি বলা হয়। হযরত গুরফা বিন হারেস আল কিন্দী জিম্মি লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি জবাবে রাসূল সাঃ কে গালি দিল। হযরত গুরফা রেগে লোকটিকে সেখানেই হত্যা করে ফেলেন।

এ সংবাদ হযরত আমর বিন আস রাঃ এর কাছে পৌঁছলে তিনি গুরফাকে বললেন, এ লোকের সাথেতো আমাদের অঙ্গিকার আছে। সে হিসেবে সে তো নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য। তুমি তাকে হত্যা করলে কেন?

গুরফা জবাব দিলেন- “তার সাথে আমাদের অঙ্গিকার একথার উপর নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূল সাঃ কে গালাগাল দিবে আর আমরা তার হিফাজত করবো”। {হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫১, উর্দু এডিশন}

শাতেমর শাস্তি প্রসঙ্গে উম্মতের ইজমা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালিগালাজ বা কটাক্ষকারী চাই মুরতাদ হোক অথবা আসলী কাফের হোক, তার একমাত্র বিধান হলো মৃত্যুদন্ড। এ ব্যাপারে প্রায় প্রথম যুগ থেকেই বহু ইমাম ইজমা (সকল উম্মতের ঐক্যমত) নকল করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সুহনূন রহ. (২৬৫হি:) বলেন:

أجمع الأمة أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر.

সমস্ত উম্মত এব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সাঃ)কে গাল-মন্দকারী ও তাঁকে কটাক্ষকারী কাফের। তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নিকট তার বিধান হলো মৃত্যুদন্ড। এবং যে তার কাফের হওয়া ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে। {আশ-শিফা: ২/২১৫, রাসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩১৬}

২. আল্লামা আবু বকর ইবনুল মুনযির রহ. (৩১৯হি:) বলেন:

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل.

যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালি দিবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ সিদ্ধান্তের উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। {আল-ইজমা:৭৬, আল-ইকনা:২/৫৮৪}

৩. ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী রহ. (৩৮৮হি:) বলেন:

وقال ابو سليمان الخطابى ”لا اعلم احدا من المسلمين اختلف فى وجوب قتله اذا كان مسلما

খাত্তাবী (রহ:) বলেন, আমি এমন কোন মুসলমানের ব্যাপারে জানিনা যে, গুস্তাখে রাসুলের হত্যার আবশ্যকতার ব্যাপারে সে মতবিরোধ করেছে। {মাআলিমুস সুনান:৬/১৯৯, রাসায়েলে ইবনে আবেদীন-১/৩১৬}

৪. আল্লামা কাজী ইয়াজ রহ. (৫৪৪হি:) বলেন:

وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، قال الله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا)

উম্মত একথার উপর ঐক্যমত্বে পৌঁছেছেন যে, মুসলমানদের মাঝে যে তাঁর কুৎসা বলবে, কিংবা গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। {আশ শিফা:২/২১১,সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ:১২/২১}

৫. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (৭২৮হি:) বলেন:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم

যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালি দিবে, চাই সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।এব্যাপারে সকল আহলে ইলমগণ একমত। {আছ ছারিমুল মাছলুল:১৩}

৬. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি:) বলেন:

والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي (ص) وفي استباحة قتله، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف في - قبول توبته إذا أسلم. فعندنا - وهو المشهور عند الشافعية القبول

মোদ্দা কথা হলো নবী (সাঃ) এর কটুক্তিকারীর কুফর ও তার রক্ত হালাল হওয়ার ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নাই। আর এটি চারও মাযহাবের ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। {রদ্দুল মুহতার: ৩/৩২১}

৭. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. (১৩৫২হি:) বলেন,

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه

সকল ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)কে গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে। {ইকফারুল মুলহিদীন:৬৪}

উল্লিখিত ভাষ্য সমুহ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গালিগালাজ ও কটাক্ষ কারীদের শাস্তি কেবলই মৃত্যুদন্ড। তাদের রক্ত বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) তার রসায়েলের মধ্যে ইজমার আলোচনা করে বলেন-

ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به، فإنه شيئ لا يعرف لأحد من العلماء، و من استقرأ سير الصحابة تحقق إجماعهم على ذلك فإنه نقل عنهم في قضايا

مختلفة منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره أحد.

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) বিদ্রুপকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্যের যে দাবি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এমন দাবি অন্য কোন আলেম থেকে পাওয়া যায় না। (আর কাফের হওয়ার বিষয়টি এতস্পষ্ট যে,) কেউ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে,এ ব্যাপারে ঐক্যমতের বিষয়টি জানতে পারবে। কারণ এটি তাদের পর থেকে বিভিন্ন বিচারের রায়ে ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে, যা কেউ অস্বীকার করেনি। {রসায়েলে ইবনে আবেদীন}

এবিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন- আস-সাইফুল মাসুলুল:প্রথম অধ্যায়। আছ ছারিমুল মাছলুল:প্রথম মাসয়ালা। রসায়েলে ইবনে আবেদিন: ১/৩৪২-৪৭।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সমালোচনা বা কটাক্ষকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড এটি নতুন কোন দাবি নয় বা মুসলমানদের উদ্ভাবিতও নয়, বরং তার মৃত্যুদন্ডের সাজা মহান আল্লাহ কর্তৃক এবং সর্বজন স্বীকৃত, যা পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। আর বলা বাহুল্য যে, কোন একজনকে এমন শাস্তি দিলে পরবর্তীতে অন্য কেউ এরূপ ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পাবে না। অন্যথায় এ ধরনের সমালোচনাকারীরা পশ্রয় পেয়ে বারবার দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করবে। তাই অন্যায়কে আশ্রয় না দিয়ে নির্মূল করাই অপরিহার্য কর্তব্য।

শাতেমকে হত্যা করা প্রসঙ্গে শরয়ী কিয়াস থেকে দলিল

আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকী রহ. (৭৫৬হি:) কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে গুস্তাখে রাসূলকে হত্যা করার বিস্তারিত দলিল পেশ করার পর, সংক্ষিপ্ত আকারে কিয়াস হিসেবেও দলিল পেশ করেছেন। তার বক্তব্য টি নিচে তুলে ধরা হলো: "নিশ্চয় মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব, এটা ইজমা ও সুস্পষ্ট নুসুস দারা প্রমানিত। তন্মধ্যে একটি হলো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী: من بدل دينه فاقتلوه যে নিজ দীনকে পরিবর্তন করবে তথা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে তোমরা তাকে হত্যা করো। [সহীহ বুখারী:৩০১৭,৬৯২২] আর কটুক্তিকারী সন্দেহাতিত ভাবেই নিজ দ্বীনকে পরিবর্তনকারী। সুতরাং আবশ্যকীয় ভাবে কটুক্তিকারীকে রাসুল (সাঃ) এর হাদিস (من بدل دينه فاقتلوه) এর হুকুমের অন্তরভুক্ত করা হবে। ফলে এটি নস দ্বারা প্রমাণিত হবে। এবং আরও আবশ্যক হলো গালি কে রিদ্দাহ এর উপর কিয়াস করা হবে। কেননা রাসুল (সাঃ) কে গালি দেওয়া বা কটুক্তি করা তা থেকে অধিক জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ। [আস-সাইফুল মাসলুল: প্রথম অধ্যায়, দিতীয় পরিচ্ছেদ}

লক্ষণীয়: যে সকল বিধানের দলিল কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের মাঝে বিদ্যমান, সে সকল বিধানের উপর আমলের জন্য কেয়াস এর অপেক্ষায় থাকা চলে না। এজাতীয় বিধানের যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক বা না হোক, এর উপর আমল অপরিহার্য।

উপরোক্ত (কুরআন হাদীস ও ইজমার আলোকে) পূর্ণ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'মহানবী (সাঃ) কে কটাক্ষ করা, তাঁর শানে বিদ্রুপপূর্ণ আচরণ করা' জঘন্যতম অপরাধ,ও দীনের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ বিদ্রোহ। যার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। তাই মুসলিম

শাসকের জন্য এ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করা ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো অপরিহার্য।

৩য় অধ্যায়

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর তওবা

মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারী নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে, আশা করা যায় পরকালের জন্য আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং তার আখেরাতের সাজা মাফ করে দিবেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু দুনিয়াতে তওবার কারণে মৃত্যুদন্ড রহিত হবে কিনা? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে।

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফতুয়া হলো, তওবার কারণে তার মৃত্যুদন্ড রহিত হবে না। চাই সে বন্দী হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে । কারণ তাদের মতে এটা ‘হদ’ (শরীআতের একটি বিশেষ শাস্তি) যা তওবার কারণে মাফ হয় না।নিচে সংক্ষেপে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

• ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন:

قال الإمام مالك :(قال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول) من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه ، قُتِل ، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب

যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) কে গালি দিবে অথবা কটুক্তি করবে অথবা দোষারুপ কিংবা মর্যাদা খাটো করবে, সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের হোক তাকে হত্যা করা হবে। তার তওবা গৃহীত হবে না। [আছ ছারিমুল মাসলুল পৃ:৩৩১]

• আল্লামা শামী (রাহ.) মালেকী মাযহাব সম্পর্কে বলেন-

وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا، إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفع استقالته، وحكمه حكم الزنديق، سواء كانت توبته بعد القدرة عليه أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة.

“ইমাম মালেক (রাহ.) সহ আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত হলো, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারীর সাজা হলো মৃত্যুদন্ড। যা ‘হদ’ হিসেবে প্রয়োগ করা হবে, কুফরী হিসেবে নয়। তাই যদি সে তওবা প্রকাশ করে, তাদের নিকট তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার দ্বারাও কোন লাভ হবে না। তার সাজা ও নাস্তিকের সাজা এক ও অভিন্ন। চাই সে আটক হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে। কেননা, এটা ‘হদ’ যা তওবা দ্বারা রহিত হয় না। [রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২০]

• ইমাম আহমদ (রাহ.) বলেন-

كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب.

যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালমন্দ করে, কটাক্ষ করে, চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। তার তওবা গ্রহণ করা হবে না।

• আল্লামা কাজী ইয়াজ (রাহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেছেন-

لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق لآدمي والعقوبة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بـ التوبة.

“এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)এর সাথে দু’টি ‘হক’ সম্পৃক্ত। আল্লাহর ‘হক’ ও বান্দার ‘হক’। আর যখন কোন সাজা বা অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেই সাজা তওবা দ্বারা মাফ হয় না। [দেখুন: আছ ছারেমুল মাসলূল, পৃষ্ঠা: ৩৯৭]

শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব

শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের ফতওয়া হলো, কটুক্তিকারী ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন। অতএব যদি সে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তওবা করে, তবে তার তওবা কবুল করা হবে। তার মৃত্যুদন্ড রহিত হবে। আর যদি তওবা না করে, তাহলে মুরতাদের ন্যায় তাকেও তিন দিন বন্দী রেখে তওবা করতে বলা হবে। তার কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে, তবে এটা আবশ্যক নয় বরং উত্তম। তাই কাজী ইচ্ছা করলে তাকে তাৎক্ষণিক

মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন। আর যদি কটাক্ষকারী বা মুরতাদ মহিলা হয়, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না বরং তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। নিচে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

• উসতাদ আবু ইসহাক শাফেয়ী (রহ.) বলেন

كفر بالسب وتعرض للسيف تعرض المرتد فاذا تاب سقط القتل

রাসুল (সা:) কে গালি দেওয়ার দ্বারা গালিদাতা কাফের হয়ে যাবে, এবং মুরতাদের ন্যায় হত্যার যোগ্য হবে। সুতরাং যদি সে তওবা করে তাহলে হত্যা রহিত হয়ে যাবে।

• আল্লামা তকীউদ্দিন সুবকী (রহ.) বলেন-

ولكن المشهور على الألسنة وعند الحكام وما زالوا يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة.

“সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ মতামত যা দ্বারা শাফে‘য়ী মাযহাবের বিচারকগণ বিচার করে থাকেন, তাহলো, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারীর তওবা কবুল করা হবে।

লক্ষণীয়: শাফী মাযহাবের কতেক আলেম বলেন শাতেমের তওবা গৃহিত হবেনা। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আল-ফারিসী, আবু বকর আল-কফ্ফাল। আরেকদল বলেন তাদের তওবা কবুল করা হবে, তাদের মধ্যে আছেন, আবু ইসহাক, আবু বকর আল মারওয়াযি, ইমাম রমলী সহ অনেকেই। এবং এই মতের উপরই মাযহাবের ফতুয়া, যেমনটা সুবকি (রহ.) বলেছেন। [দেখুন: আস-সাইফুল মাসলুল: প্রথম অধ্যায়, দিতীয় পরিচ্ছেদ]

হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা শামী (রাহ.) বলেন- গালিদাতার তওবা কবুল করা হবে এবং তওবার দ্বারা তার মৃত্যুদন্ড রহিত হয়ে যাবে ও তাকে তওবা করতে বলা হবে। এমতটি ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও তাঁর শাগরেদগণ থেকে বর্ণিত আছে। অতপর তিনি এ বিষয়ে আবু ইউসুফ ও ইমাম ত্বহাবী (রহ.) এর বক্তব্য উল্লেখ করেন:

ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ বলেন,

قال في كتابه الخراج : أيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل

তিনি ‘কিতাবুল খারাজ’ এ বলেন, যে কোন মুসলমান রসূল (সা.)কে গালি দিবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাঁর সমালোচনা করবে বা কটাক্ষ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে তওবা করে, তবে মাফ করা হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম তহাবী (রহ) বলেন,

ونقلوه في عدة كتب عن شرح الطحاوي من أنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد

ইমাম ত্বাহাবী (রাহ.) এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারী মুরতাদ। তার হুকুম ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন। ফলে মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার সাথেও তাই করা হবে। [দেখুন: রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩৪৩]

আল্লামা শামীর চূড়ান্ত বক্তব্য

ফিকহে হানাফির কিছু নির্ভরযোগ্য কিতাবে যেমন ফাতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া, ফাতহুল কাদিরসহ অনেক কিতাবেই আছে যে, শাতেমের তাওবা কবুল হবেনা। তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তবে এটা জমহুর ওলামায়ে আহনাফের মত নয়। এবং এই কথার উপর ফতোয়াও নয়।বিষয়টি উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

মুতায়াখখিরিন ওলামায়ে আহনাফের অন্যতম ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদিন আশ-শামী রহ. (মৃত্যু ১২৫২) শাতেম এর বিধিবিধান নিয়ে "তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম আলা আহকামি শাতিমি খয়রিল আনাম" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচানা করেছেন। সেখানে তিনি মৌলিক ভাবে প্রমান করেছেন শাতেমের তাওবা কবুল হবে, এবং তার থেকে তাওবা চাওয়া হবে। এই মর্মে ওলামায়ে আহনাফের অবস্থান উল্লেখ করার পর তিনি জোরালোভাবে নিজের অবস্থান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

একজন মুসলিমের বাহ্যিক অবস্থা তো এটাই যে, তার থেকে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কোনো অযাচিত বক্তব্য প্রকাশ পাবে তা হয়তো তার ভুলে বা নির্বুদ্ধিতা অথবা মুখ ফসকে বের হয়েছে। সে দৃঢ়ভাবে সেগুলো বিশ্বাস করে এমন নয়। তবে যদি কোনো মুসলিম থেকে তা বারবার প্রকাশ পায় এবং সেটা তার বিশ্বাসের অংশ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, সে এইগুলোর দাওয়াত দিয়ে বেড়ায় তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তার ইসলাম এবং তাওবা কোনোটাই কবুল করা হবেনা। যেমনি ভাবে যিন্দিক

এর বিধান। যদি সে তাওবা করে তাহলে তার তাওবাকে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে তাকিয়া (তুষামোদ) ধরা হবে। এমন ক্ষেত্রে যিম্মির বেলায়ও একই বিধান। [পুর্ণ আলোচনাটি দেখুন: রাসায়েলে ইবনে আবেদিন।১/৫৪৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ]

৪র্থ অধ্যায়

শাতেম যদি যিম্মি হয় তার বিধান

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তার অনুসারীদের অভিমত হলো: যিম্মি যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে, তাহলে শুধু কটুক্তি করার দ্বারা তার নিরাপত্তা-চুক্তি ভেঙ্গে যায়না, এবং এজন্য তাকে হত্যা করা হবেনা। বরং তাকে 'তাযির' হিসেবে শাস্তি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তবে যদি উক্ত অপরাধ বারংবার করে তাহলে তাকে হত্যা করার অধিকার মুসলিম শাষকের রয়েছে। তারা এটার নামকরণ করেছেন "কতল বিস-সিয়াসাত"

২. ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, এই গর্হিত কর্মের কারণে যিম্মির নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাবে, এবং তাকে হত্যা করা হবে। (আল-উম্ম:৪/২০৮) ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইমাম মাওরিদীও এমনটা বলেছেন।

৩. ইমাম মালেক (রহ.) এর অভিমত হলো, কটুক্তি কারীর একামত্র শাস্তি- তাকে হত্যা করতে হবে। যিম্মির ব্যাপারে কতিপয় আলেমের ভিন্ন কথা থাকলেও ওনার মুল বক্তব্য হলো কটুক্তি দ্বারা তার চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

৪. ইমাম আহমদ (রহ.) ও তাঁর প্রায় সকল অনুসারীদের অভিমতই হলো, কটুক্তিকারী যদি যিম্মি হয় তবুও তার চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। তবে কেউ কেউ ইমাম আহমদ (র.) এর আরেকটি বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন প্রথমটিই (যুক্তি-প্রমানের) অধিক নিকটবর্তী। হাম্বলী মাযহাবের ফতুয়া এটাই।

বি.দ্র: এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) উনার কিতাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মাসআলায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে খোলাসা কথাগুলোই তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে বিস্তারিত মুতালায়া করে নিতে পারেন। তাছাড়া আল্লামা সুবকি (রহ.) উনার কিতাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা টেনেছেন।

শাতেমকে নিজ উদ্যোগে হত্যা করার বিধান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কটাক্ষকারীকে যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেটা নাজায়েয বা অবৈধ হবে না। কারণ, এক ইহুদী কাফের নারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে হত্যা করেন। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর কাজকে সমর্থন করেছেন। হত্যাকারীকে কোনো গালমন্দ করেননি এবং ইহুদী নারীর জন্য কোনো রক্তপণ বা দিয়তও সাব্যস্তকরেননি। এমনিভাবে নিজের দাসিকে হত্যা করার কারণেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধ সাহাবীকে কোনোরূপ দোষারোপ করলেন না। উল্টো দাসির রক্ত বৃথা বলে ঘোষণা দিলেন।

নিচে হাদিস দুটি পেশ করা হলো:

১. ইমাম আবু দাউদ রহ. আলী রাদি. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

أَنّ يَهُودِيّةً، كانَتْ تَشْتِمُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا.

এক ইয়াহুদী মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। ফলে এক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রক্ত বাতিল বলে ঘোষণা করেন। [সুনানে আবু দাউদ:৪৩৬২]

২. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, ‘এক অন্ধ লোকের একটি ‘উম্মু ওয়ালাদ’ দাসী ছিল। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করত, তাকে নিয়ে কটূক্তি করত। ফলে অন্ধ লোকটি ধারালো একটি ছুরি নিয়ে দাসীর পেটে বিধিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখলেন। এই ঘটনা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনানো হলে তিনি বললেন: ألا اشهدوا أن دمها هدر - তোমরা সাক্ষী থেকো ওই দাসীর রক্ত মূল্যহীন। [সুনানে আবু দাউদ:৪৩৬১]

তাছাড়া হানাফি ও শাফী মাযহাবে কটুক্তিকারী ও মুরতাদের বিধান একই। মাযহাবের কিতাব সমুহে এটা সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ আছে যে, মুরতাদকে যদি তওবার সুযোগ দেওয়ার পূর্বেই কেউ সেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কেসাস বা দিয়ত আসবেনা, এবং তার কোন গুনাহও হবেনা। নিচে ইমাম গণের দুটি বক্তব্য পেশ করা হলো:

১. ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী (রহ.) বলেন

قال أصحابنا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب، ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء، ولا ضمان عليه

আমাদের ওলামায়ে আহনাফ বলেন- পূনরায় ইসলামের দিকে আহবান করা ছাড়া মুরতাদকে হত্যা করা হবেনা। তবে কেউ তার আগেই হত্যা করে ফেললে সে ভুল করেছে। তার উপর কোনো জরিমানা আসবেনা। (মুখতাছার ইখতিলাফিল উলামা ৩/৫০১)

২. মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন:

إن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك ولا شيء عليه لزوال عصمته بالردة

যদি ঘটনাক্রমে কেউ মুরতাদকে তওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করে ফেলে, তাহলে কাজটি মাকরূহ হবে। তবে হত্যাকারীর উপর কোন কেসাস বা দিয়ত কিছুই ওয়াজিব হবে না।কেননা মুরতাদ হওয়ার দরুণ তার রক্ত মূল্যহীন হয়ে গেছে। (বাদায়েউস সানায়ে- ৭/১৩৪)

এবং এতে কোন সন্দেহ বা মতানৈক্য নাই যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে গালিগালাজ বা তার নামে কটুক্তি করা স্বাভাবিক রিদ্দাহ থেকে আরও গুরুতর ও জগন্যতম অপরাধ। কাজেই তাকে কেউ নিজ উদ্যোগে হত্যা করলে সেটাতো কখনোই মন্দ বা গোনাহের কারণ হতে পারেনা। বরং বর্তমান বিশ্বে এটা হবে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

হ্যাঁ, তবে সরকার যদি শাতেমের যথাযথ শাস্তি-বিধান বাস্তবায়ন করে, তাহলে বাকিদের জন্য কর্তব্য হলো এটা সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া এবং শাতেমের উপর নিজ থেকে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা থেকে থেকে বিরত থাকা।

আমাদের শেষ বার্তা:

যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কটূক্তিকারীদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অস্ত্র হাতে নেয়, নি:স্বন্দেহে তারাও মুজাহিদ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যদি কেউ গালি দেয়, তার কুৎসা রটনা করে, তাহলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ একমত। (উপরে বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছে)। আমাদের দেশের সরকার যেহেতু তাগুতী সরকার। তাই তারা এই বিধান কার্যকর করে না। বরং তারা বাক স্বাধীনতার নামে ঐ জাহান্নামের কুকুরগুলোকে এজাতীয় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে দেয়। যেহেতু সরকার ঐ কুকুরগুলোর যথাযথ বিচার করবে না, তাই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুসলিম যদি একতাবদ্ধ (জামাতবদ্ধ) হয়ে নিজেদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করে, আমীরের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ঐ কুকুরগুলোকে তাদের যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে এ কাজটি হবে প্রশসংনীয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণ মুজাহিদ বলে গণ্য হবে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের উচিত অন্তর থেকে তাদেরকে সমর্থন করা, ভালবাসা, এবং তাদের জন্য দুআ করা। কারণ, তারা সমস্ত মুসলিমের পক্ষ থেকে শাতেমে রাসূলকে তার উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের জন্য দুআ না করে, তাদেরকে ভাল না বেসে ঘৃণার সূরে তাদেরকে জঙ্গী বলা, তাদের

বিরুদ্ধাচরণ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ প্রকৃত পক্ষে উক্ত ব্যক্তির অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসা নেই। বরং তার মায়া ও ভালোবাসা হলো রাসুল (সা:) এর দুশমন- শাতেম, গোস্তাখ ও তাদের নিরাপত্তা প্রদান কারী তাগুত প্রশাসনের প্রতি। অথচ ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো অন্য সকল কিছুর মোকাবেলায় রাসুলুল্লাহ (সা:) এর ভালোবাসাকে অন্তরে বদ্ধমূল করে নেওয়া। এতে যদিও গোটা দুনিয়ার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে হয় তবুও।

৫ম অধ্যায়

নবীজি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য

- إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

  নিশ্চই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।(সূরা ফাতহ:৮,৯)

- لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن

كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও বিধিবিধান শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে ইমরান:১৬৪)

- إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

নিশ্চই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ অর্পন করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।(সূরা আহযাব:৫৬)

- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না! এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে আর তোমরা টেরও পাবে না। (সূরা হুজরাত:২)

- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখে, আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকেই তাকওয়ার জন্যে শোধিত

করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।(সূরা হুজরাত:৩)

- وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনোই বৈধ নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (সূরা আহযাব:৫৩)

- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা আহযাব:৫৭)

- سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা ইসরা:১)

- وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ

ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ

আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অস্বীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি- কিতাব ও জ্ঞান, অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসলে যে, তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন কারী, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, ‘আমরা অঙ্গীকার করেছি’। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।(সূরা আলে ইমরান:৮১)

- তাছাড়াও আরও বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার রসূল (সা:) এর মর্যাদা ও গুনাগুন নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিচে আরও কয়েকটি আয়াত ও আয়াতংশের অনুবাদ উল্লেখ করা হলো:

- নবীজি মুমিনদের কাছে নিজেদের জিবন অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। (আহযাব:৬) আপনাকে জগৎবাসির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া:১০৭) আপনি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। (আনফাল:৩৩) এবং আপনাকে সকলের উপর সাক্ষী সরুপ উঠাবো। (নিসা:৪১) আপনার জিবনের শপথ! কাফেররা উন্মাদনায় উদ্ভ্রান্ত। (হিজর:৭২) আল্লাহ তায়ালাই আপনাকে শত্রু থেকে রক্ষা করবেন (মায়েদাহ:৬৭) যদি তোমরা তাকে সাহায্য নাও করো, তাহলে আল্লাহ'ই তাকে সাহায্য করবেন। (তওবাহ:৪০)

নবীজি সম্পর্কে অমুসলিম স্কলারদের বক্তব্য

1. *Michael H. Hart said– on the topic why Muhammad (pbuh) topped his list— "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most intellectual persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.*

মাইকেল এইচ. হার্ট বলেন: 'মুহাম্মাদকে (সাঃ) বিশ্বের সেরা বুদ্ধিদীপ্ত মানুষদের' তালিকায় সবার উপরে স্থান দেয়ার ব্যাপারটা অনেক পাঠককে হয়তো অবাক করবে! আবার কেউ কেউ হয়তো এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে। কিন্তু সমগ্র ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় এবং সাংসারিক উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতার অধিকারী। [এম. এইচ. হার্ট, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons on History, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩৩]

2. *George Bernard Shaw said— "I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness."*

"He established a powerful and dynamic society to practice and represent his teachings and completely

revolutionized the worlds of human thought and behavior for all times to come" (The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, No. 8. 1936)

নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শৌ মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন: "আমার বিশ্বাস যদি তাঁর মতো একজন মানুষ বর্তমান বিশ্ব পরিচালনা করতেন তবে আজকের সমস্যাগুলো দূর হয়ে যেতো এবং প্রয়োজনীয় শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হতো। "তিনি একটি শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ছিল তার শিক্ষার প্রতিফলন এবং এই সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার চিন্তাধারায় অমূল্য পরিবর্তন সাধন করেছিল। [The Genuine Islam, সিঙ্গাপুর, ১৯৩৬, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮,]

3. *Historian Alphonse de LaMartaine said—'Philosopher, orator, apostle legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and one spiritual empire, that is MUHAMMAD As regards all the standards by which Human Greatness may be measured, we may well ask, IS THERE ANY MAN GREATER THAN HE? [Lamartine Histoire De La Turquie. Paris, 1854 vol.2, page 276-277]*

ফরাসী ইতিহাসবেত্তা আলফোস দ্য ল্যামারটেইন বলেছেন: দার্শনিক, বক্তা, স্বর্গীয় বার্তাবাহক, আইন প্রয়োগকারী, যোদ্ধা, চিন্তাধারার সংশোধনকারী, প্রতিমূর্তি বিহীন ও যুক্তিসম্মত ধর্ম-মতের পুনরাতিষ্ঠাকারী, বিশটি ভূ-সাম্রাজ্য আর একাত্ববাদ প্রতিষ্ঠাতাই হলেন

মুহাম্মাদ (সা.), মানবীয় গুণাবলী পরিমাপের সকল মাপকাঠি বিবেচনায় এনে এক কথায় আমরা বলতে পারি, তাঁর থেকে উত্তম মানুষ কি কেউ আছে?। [Lamartine Histoire De La Turquie, প্যারিস, ১৮৫৪,২য় খন্ড, পৃষ্ঠা:২৭৬-২৭৭]

4. *Mahatma Gandhi said— I was more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in Allah and his own mission..."*

(The statement was published in the Young India" in 1924)

মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমার বদ্ধমূল ধারণা যে, সেই সময়ে মানব জীবনে ইসলাম যে স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তার মূল কারণ তরবারি নয়, বরং তা ছিল ইসলামের শৈখিলাবিহীন সরলতা, নবীর একাগ্র বিন্যা, অজুহাতের বিপরীতে নৈতিক অবস্থান, বন্ধু আর অনুসারীদের প্রতি প্রবল মনোযোগ, তাঁর সাহসীকতা, নির্ভীকতা এবং আল্লাহ উপর ও স্বীয় দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা.। [এই বক্তব্য ১৯২৪ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়]

সিরাতে রাসূল [নবী জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র]

নবীজির জন্ম :

বসন্তকালের সোমবার তাঁর জন্ম, এ ব্যাপারে সবাই একমত। প্রসিদ্ধ মতে, ১২ই রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকের সময় নবীজীর জন্ম হয়েছে। কা'বা শরীফের উপর আবরাহার হস্তীবাহিনীর হামলা ৫০ দিন পর মুতাবেক ২২ এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক তাবারী এবং ইবনে খালদুনও ১২ই রবিউল আউয়াল জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। সোমবার তাঁর জন্ম, এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু ঐ বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পড়ে না, সোমবার পড়ে ৯ই রবিউল আউয়াল।

আরব ঐতিহাসিক মিসরের মুহাম্মদ তালআত বিক-এর মত সমর্থন করে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' গ্রন্থের রচয়িতা কাজী সুলায়মান মনসুরপুরী ৯ তারিখের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

মিসরের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ৯ই রবিউল আউয়াল নবীজীর জন্ম হয়েছে। তাঁর মতে, দিনটি ছিল ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ । সীরাতুন্নবী গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা শিবলী নুমানী এ মত সমর্থন করেন।

আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থের প্রণেতা হাকীম আবদুর রউফ দানাপুরী ৮ বা ১২ই রবিউল আউয়াল দু'টি তারিখ উল্লেখ করেন। অবশ্য, এ বক্তব্যের সূত্র বা উৎস সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেননি। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রহ:)-এর মতে, ১২ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাত্রে নবীজীর জন্ম হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ৯ই রবিউল আউয়াল তাঁর জন্ম হয়েছে, এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত।

দুধ পান :

জন্মের দু'তিন দিন পর থেকে তিনি আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবিয়ার দুধ পান করেন কিছুদিন। পরে ধাইমা হালীমা সা'দিয়ার দুধ পান করেন যথারীতি। তিনি তখন ৪ মাসের শিশু।

পিতা-মাতার ইনতিকাল :

জন্মের ৬ মাস পূর্বে পিতা আবদুল্লাহর ইনতিকাল হয়। ৬ বছর বয়সে মদীনার পথে আবওয়া নামক স্থানে মায়ের ইনতিকাল হয়।

দাদার ইনতিকাল :

৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল হয়। এ সময় চাচা আবু তালিব তাঁকে প্রতিপালন করেন।

শাম সফর :

১২ বছর ২ মাস বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে প্রথমবার শাম দেশ সফরে গমন করেন। বোহায়রা পাদ্রীর সাক্ষাত এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এ সময়ের ঘটনা।

হরবুল ফুজুরে অংশগ্রহণ :

এটা প্রথম দফায়। তখন নবীজীর বয়স ১৫ বছর। কিছুদিন পর দ্বিতীয় দফা তিনি এতে অংশ নেন।

হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ :

হিলফুল ফুযুল একটি সংস্কারমূলক সংগঠন। ১৬ বছর বয়সে নবীজী এ সংগঠনে যোগ দেন।

শাম দেশে দ্বিতীয় দফা সফর :

বিবি খাদীজা (রাঃ) পণ্যসম্ভার নিয়ে এ সফরে গমন করেন ২৩/২৪ বছর বয়সে।

খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ :

২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে।

গায়বী রহস্য প্রকাশের সূচনা :

নবুওয়াত লাভের ৭ বছর পূর্বে ৩৩ বছর বয়সে।

সালিশ নিযুক্তি :

হারাম শরীফের সংস্কার উপলক্ষে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সবাই নবীজীকে আল-আমীন বলে সালিশ মেনে নেন। নবীজী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান দেন। তখন তার বয়স ৩৫ বছর।

নবুওয়াত লাভ :

৪০ বছর ১১ দিন বয়সে। দিনটি ছিল সোমবার ৯ই রবিউল আউয়াল। তবে, এ তারিখ নিয়ে বেশ মতভেদ দেখা যায়। এক বর্ণনা মতে, চন্দ্র বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তখন নবীজীর বয়স ৪০ বছর ৬ মাস ১৬ দিন। আর সৌর বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ৩৯ বছর ৩ মাস ১৬ দিন। কেউ বলেন, ২৫ রমযান। কেউ বলেন, ২৬ রমযান দিবাগত শবে কদরে। কারো কারো মতে, ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী। কেউ বলেন, ৬ই আগষ্ট। যাদুল মাআদ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম ৮ ই রমযান উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ৮ তারিখ নয়, বরং ৯ তারিখ সোমবার পড়ে। হযরত জিবরীল (আ:) হেরা গুহায় উপস্থিত হয়ে বলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনি

আল্লাহর রাসূল। আমি জিবরীল।

ঘটনার আকস্মিকতায় নবীজী অস্থির হয়ে উঠলে হযরত খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দান করেন।

সালাত ফরয করণ :

নবুওয়াত লাভের প্রথম দিন থেকে ফজর এবং আসর-এর দু' রাকাআত সালাত ফরয হয়।

কুরআন নাযিলের সূচনা :

নবুওয়াত লাভের প্রথম বর্ষে ১৮ রমযান মুতাবিক ১৭ আগষ্ট শুক্রবার রাতে প্রথম সূরা আলাক এর পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। ঐতিহাসিক তাবারী ১৭ এবং ১৮ই রমযান দু'টি তারিখ উল্লেখ করেন। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী শুক্রবার পড়ে ১৮ই রমযান।

গোপন দাওয়াতের যুগ :

নবুওয়াতের প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় ছাফা পর্বতে অবস্থিত আরকাম মাখযুমীর গৃহ ছিল ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এ সময় প্রায় চল্লিশজন গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা গোপনে সালাত আদায় করেন।

প্রথম ইসলাম গ্রহণ :

নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা, পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে নবুওয়াতের ঘোষণা :

নবুওয়াতের তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে। সাফা পর্বতে আরোহণ করে প্রকাশ্যে সকলের সামনে রিসালাতের পয়গাম দেন।

বিরোধিতার প্রথম যুগ :

বিদ্রূপ, উপহাস আর মৃদু নির্যাতন–নবুওয়াতের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় চাচা আবু তালিবের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কুরাইশের বিভিন্ন প্রতিনিধি দাল আলাপ-আলোচনা চালায়। বিশেষ বিশেষ বৈঠকে বিরোধিতায় নানা কৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

তীব্র বিরোধিতার সূচনা :

নবুওয়াতের ৫ম থেকে ৭ম বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় মুশরিকদের থেকে চরম বিরোধিতা আর তীব্র নির্যাতন শুরু করা হয়।

হাবশায় হিজরত :

নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে রজব মাসে আবিসিনিয়ায় হিজরত শুরু হয়।

হযরত হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ :

নবুওয়াত লাভের ৬ষ্ঠ বর্ষে। হযরত উমর (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ) এর তিন দিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে হযরত হামযা নবুওয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

গণঅবরোধ–শিবঈ আবি তালিব :

নবুওয়াতের ৭ম বর্ষে ১লা মহররম মঙ্গলবার।মুশরিকরা নবীজীর বংশ বনু হাশিমসহ মুসলমানদেরকে গণবয়কট করে। এবং তারা শি'ব-এ আবু তালিব-এ আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকে।

গণঅবরোধ ও নজরবন্দীর অবসান :

নবুওয়াতের নবম বর্ষের শেষের দিকে বা দশম বর্ষের প্রথম দিকে। অবরোধের তিনবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

দুঃখ ও শোকের বছর :

নবুওয়াতের দশম বর্ষে চাচা আবু তালিব ও (তিন দিন ব্যবধানে) স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন। নবীজী (সাঃ) এ বৎসরটিকে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলে আখ্যায়িত করেন।

তায়েফ গমন :

নবুওয়াতের দশম বর্ষে জুমাদাল উখরা মাসে নবীজী তায়েফ গমন করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কোন কোন বর্ণনায় ২৬-২৭ শাওয়ালও উল্লেখ করা হয়।

মি'রাজে গমন :

নবুওয়াতের দশম বর্ষে ৫০ বছর বয়সে ২৭ রজব সোমবার রাতে। এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

মদীনায় ইসলামের সূচনা :

নবুওয়াতপর দশম বর্ষে মদীনায় আয়াস ইবনে মু'আয ইসলাম কবুল করেন।

প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণ:

মদীনার একটি প্রতিনিধি দল (১৬ জন) নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের জিলহজ্জ মাসে মক্কায়, নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

আকাবার প্রথম শপথ :

নবুওয়াতের দশম বর্ষের জিলহজ্জ মাসে (১২ই জুন) এ শপথে অংশ নেন।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

তার এক বছর পর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে ৭৫ জন এ শপথে অংশগ্রহন করেন।

হিজরত: মক্কা–মদিনা

মক্কা থেকে সাওর গুহায়: নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে সফর মাসের ২৭ তারিখ রাত্রে মক্কা থেকে বের হন। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে নবীজীর বয়স ৫৩ বছর পূর্ণ হয়ে ৫৪ বছর শুরু হয়, সাথে সাথে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হয়ে চতুর্দশ বছরও শুরু হয়।

সাওর গুহা থেকে রওয়ানা: পয়লা রবিউল আউয়াল সোমবার মুতাবেক ১৬ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ।

কোবায় উপস্থিতি: নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষের ৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর।

কোবা থেকে মদীনায় রওয়ানা: ১২ ই রবিউল আউয়াল নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষ। শুক্রবার মদীনায় উপস্থিত হন। কোবায় বনু মালিক-এর মহল্লায় জুমার নামায আদায় করেন। একটি শক্তিশালী বর্ণনা মতে, নবীজী কোবায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। সহীহ বুখারীতে কোবায় অবস্থানের মেয়াদ দশ দিনের কিছু বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কোন কোন বর্ণনা মতে, মদীনায় উপস্থিতির তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।

মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন :

হিজরী প্রথম বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে।

ফরয সালাতে সংযোজন :

হিজরী প্রথম সনের রবিউস সানী মাসে। এ সময় জুহর, আসর এবং ঈসার চার রাকাআত করে সালাত ফরয করা হয়।

পারস্পরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন :

মদিনায় গমনের পর, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়। প্রথম হিজরীর প্রথম তিন মাসের মধ্যে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর ঘরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ৯০ জন মুহাজির-আনসার উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :

হিজরী প্রথম সনের মধ্য ভাগে। এ সময় মদীনার অধিবাসীদের সঙ্গে একটা শাসনতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা :

হিজরতের সপ্তম মাসের শুরুতে এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। এ সময় সামরিক শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত তিনটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়—

(ক) হিজরতের ৭ম মাসে (রমযান) হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের একটা বাহিনী সায়ফুল বাহর পর্যন্ত গমন করে।

(খ) হিজরতের অষ্টম মাসে (শাওয়াল) ওবায়দা ইবনুল হারিসের নেতৃত্বে ৬০, মতান্তরে ৮০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনী সংগে করে অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

(গ) হিজরতের নবম মাসে (যিলকদ) হযরত সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস ২০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনী সহ খায়বার পর্যন্ত গমন করেন। অতঃপর 'উদ্দান' অভিমুখে নবীজী নিজেও একটা বাহিনী নিয়ে গমন করেন।

[এ সকল বাস্তব পদক্ষেপ আর কর্মতৎপরতা দৃষ্টে এ কথা বলা যায় না যে, জিহাদের অনুমতি সম্বলিত প্রসিদ্ধ আয়াত দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীতে কার্যত জিহাদ শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে বাস্তবে সংঘাতে প্রবৃত্ত হতে বারণ করা যায়। সুতরাং ধরে নিতে হয় যে, জিহাদের অনুমতিসম্বলিত আয়াত হিজরতের পূর্বেই নাজিল হয়েছে যাতে ধৈর্যের স্তর অতিক্রম করে আগামী দিনে জিহাদের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মুসলমানরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।]

নবীজীর ঘরে আয়েশা (রাঃ) আগমন :

হিজরী প্রথম সনের শাওয়াল মাসে। তখন আয়েশা (রা:) এর বয়স ছিল ৯।

দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ :

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম [ইনি ছিলেন বিজ্ঞ ইহুদী পন্ডিত] এবং (২) হযরত আবূ কায়স সারহা ইবন আবূ আনাস [ইনি ছিলেন বিজ্ঞ খৃস্টান পাদ্রী]। এঁরা দুজন হিজরী প্রথম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদের ফরমান :

কার্যত জিহাদ শুরুর অনুমতি প্রদান করা হয়–

দ্বিতীয় হিজরীর ১২ সফর বা হিজরতের এক বছর ২য় মাসে ১ম দিনে।

প্রথম সামরিক এবং রাজনৈতিক সফর :

তা হলো উদ্‌দান অভিযান। দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে তথা হিজরতের ১২ মাস পরে।

বাইরের গোত্রের সাথে চুক্তি :

দ্বিতীয় হিজরীর সফর থেকে জুমাদাল উখরা সময়ের মধ্যে। এ সময় বনী সুমরা, বুয়াত-এর অধিবাসী এবং বনু মুসলাজ-এর সঙ্গে চুক্তি স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুহায়না কবীলার নেতা মজদী জুহায়নী বনূ যুমরার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মদীনার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

কুরয ইবন জাবির ফিহরীর দস্যুতাঃ

এটা ছিল শত্রুপক্ষের প্রথম হস্তক্ষেপ, দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

নাখলার ঘটনা :

মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রথম সীমান্ত অভিযান, হিজরী দ্বিতীয় সালে রজব মাসের শেষের দিকের ঘটনা। এতে আমর ইবন হাদরামী নামে জনৈক কাফির মারা যায়, উষ্ট্র আর রসদ-সম্ভারসহ দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। নবীজী এ ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ: ২য় হিজরীতে।

আযানের সূচনা: ২য় হিজরীতে।

যাকাত ফরয করা হয়: ২য় হিজরীতে।

কিবলা পরিবর্তন: দ্বিতীয় হিজরীর **১৫ই** শাবান সোমবার।

রমযানের রোযা ফরয করা হয় :

দ্বিতীয় হিজরীর পয়লা রমযান বুধবার। যেহেতু বেশীর ভাগ বর্ণনা দ্বারা বদর যুদ্ধ **১৭ই** রমযান শুক্রবার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই যেসব বর্ণনায় পয়লা রমযান রোববার বলা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঈদুল ফিতরের জামাত :

জামায়াতের সাথে ঈদুল ফিতরের নামায আদায় এবং সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান জারী করা হয়- দ্বিতীয় হিজরীর পয়লা শাওয়াল।

বদর যুদ্ধ :

১৭ই রমযান, ২য় হিজরী, শুক্রবার। আলী (রাঃ)-র সঙ্গে ফাতেমা (রাঃ)-র বিবাহ হয় দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরই।

বনু কায়নুকা গোত্রকে অবরোধ :

দ্বিতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের মধ্যভাগ থেকে যিলকদ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত।

হযরত হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) সঙ্গে নবীজীর বিবাহ : তৃতীয় হিজরী।

হযরত উসমানের সঙ্গে নবীজীর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-র বিবাহ : তৃতীয় হিজরী।

মদপান নিষিদ্ধ করার প্রাথমিক বিধান : তৃতীয় হিজরী।

ইমাম হাসানের জন্ম : ১৫ই রমযান তৃতীয় হিজরী।

ওহুদ যুদ্ধ :

তৃতীয় হিজরী। মদীনা থেকে রওয়ানা- ৫ই শাওয়াল শুক্রবার জুমার নামাযের পর। তুমুল যুদ্ধ- ৬ই শাওয়াল শনিবার।

সুফিয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন :

মুসলিমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন- ৭ই শাওয়াল রোববার।

সূদ ত্যাগ করার প্রাথমিক বিধান :

তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে।

এতীমদের সম্পর্কে প্রাথমিক বিধান :

ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর।

উত্তরাধিকার আইনের বিস্তারিত বিধান :

ওহুদ যুদ্ধের পর।

দাম্পত্য বিধান :

স্বামী-স্ত্রীর যথাযথ অধিকার এবং মুশরিক রমণী বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়- তৃতীয় হিজরীতে।

যয়নব বিনতে খুযায়মার (রাঃ) সঙ্গে নবীজীর বিবাহ : তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে। ওহুদ যুদ্ধে তিনি বিধবা হন। তিনি ছিলেন উম্মুল মাসাকিন।

রাজী-এর দুঃখজনক ঘটনা :

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে। এতে দশ সদস্যের একটা মুসলিম প্রতিনিধি দল দাওয়াতী অভিযানে বের হয়ে শহীদ হন।

বনু নযীরের সঙ্গে যুদ্ধ : চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে খুযায়মার ইন্তেকাল : চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিকে। নবীজীর সঙ্গে বিবাহের পর তিনি মাত্র দু'তিন মাস বেঁচেছিলেন।

পর্দার বিধান জারী : প্রথম যিলকদ চতুর্থ হিজরী রোজ শুক্রবার।

মদপান নিষিদ্ধ করে চূড়ান্ত বিধান জারীঃ চতুর্থ হিজরীতে।

বদরে সূগরা :

যিলকদ চতুর্থ হিজরী, অবশ্য চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আবু সুফিয়ান উপস্থিত হয়নি।

দওমাতুল জান্দাল যুদ্ধ :

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। তবে যুদ্ধ হয়নি।

বনুল মুস্তলিক যুদ্ধ :

৫ম হিজরীর ৩ শাবান। এ যুদ্ধের সফরে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়। এমাসে জুয়াইরিয়ার (রাঃ)-র সঙ্গে নবীজীর বিবাহ সংগঠিত হয়। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ)-র প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনাও ৫ম হিজরীর শাবান মাসে।

মুতার যুদ্ধ :

৭ম হিজরীর জুমাদাল উলা সনে।

এই হিজরীতে নবীজীর সঙ্গে হযরত মায়মুনার (রাঃ) বিবাহ সংগঠিত হয়। জাবালা গামমালীর ইসলাম গ্রহণও ৭ম হিজরী সনে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি :

৬ষষ্ঠ হিজরীতে এই হুদায়বিয়া নামক স্থানে এই সন্ধি স্থাপিত হয়। অতপর মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন করা হয় ৮ম হিজরীর রজব মাসে।

মক্কা বিজয় :

মদীনা থেকে রওয়ানা- ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান। বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ- ২০ই রমযান। অপর পক্ষে শক্তিশালী বর্ণনা পাওয়া যায় যে, নবীজী ১৮ রমযান পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। সুতরাং মক্কায় প্রবেশের তারিখ হবে- ২৯/৩০ রমযান। এ হিজরীতে রমযান মাসেই (ক) নাখলায় অবস্থিত ওষ্যা মূর্তি ধ্বসানোর জন্য হযরত খালিদ ইবন ওলীদের (রাঃ) নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। (খ) সুয়া মূর্তি ধ্বসানোর জন্য হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর নেতৃত্বে এবং (গ) মানাত মূর্তি বাতিলের জন্য হযরত সা'আদ আশহালীর (রাঃ) নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। (ঘ) অতপর মক্কায় অবস্থান করেন ৯ই শাওয়াল পর্যন্ত। অন্য বর্ণনা মতে, ১৮ই শাওয়াল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান।

হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ :

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইয়নে অভিযান পরিচালনা করেন। অতপর শাওয়াল মাসের শেষ দিক থেকে যিলকদ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় ১৮/২০ দিন পর্যন্ত তায়েফকে অবরোধ করে রাখেন।

মাকহুল-এর বর্ণনা মতে, অবরোধ চলে ৪০ দিন। অতপর গনীমতের মাল বন্টন শেষে ওমরাহ পালন করেন যিলকদ মাসে। এ হিজরীতে— (ক) সূদ চূড়ান্তরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। (খ) বিভিন্ন সর্দার ও প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন ঘটতে থাকে। (গ) নবীজী তনয়া হযরত যয়নবের (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। (ঘ) নবীজীর পুত্র হযরত ইবরাহীমের (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

তাবুক যুদ্ধ :

৯ম হিজরী রজব মাসে, তাবুক অভিমুখে মদীনা থেকে রওয়ানা হন- বৃহস্পতিবার। এ হিজরীতে—(ক) যাকাত সংগ্রহের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় মুহাররম মাসে। (খ) জিয়ার বিধান জারী করা হয় যুদ্ধকালে বা এক বর্ণনামতে, যুদ্ধের পূর্বে। (গ) কা'ব ইবনে হায়রের ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। কবি বানাত সুয়াদ (রাঃ) কবিতা পাঠ করে শুনালে নবীজী গায়ের চাদর দান করে কবিকে অভিনন্দিত করার ঘটনা। (ঘ) যিলহজ মাসে হজ্ব ফরজ করা হয়। আরেক বর্ণনায় ১০ম হিজরীতে। (ঙ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নেতৃত্বে প্রথম হজ পালন।

সকল চুক্তির বিলুপ্তি :

কাফিরদের সঙ্গে অসম চুক্তি বাতিল ঘোষণাঃ ১০ম হিজরীতে রবিউস সানী মাসে। এ হিজরীতে- (ক) নবীজী শেষ রমযানে ২০ দিন ইতেকাফ পালন করেন। (খ) নবীজীর নিকট মুসায়লামা কাযযাব-এর পত্র প্রেরণ।

বিদায় হজ্ব :

মদীনা থেকে রওয়ানা: ১০ম হিজরীর ২৬ যিলহজ শনিবার জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে।

যুল হুযায়ফায় অবস্থান: শনি ও রোববারের মধ্যবর্তী রাত্রি।

ইহরাম বাঁধেন: রোববার জোহরের সময়।

'যি তুয়ায়' অবস্থান: রোববার দিবাগত রাত্রি।

"যি তুয়া' থেকে মক্কায় রওয়ানা: ৫ যিলহজ ফজর নামায শেষে।

মসজিদে হারামে প্রবেশ: ৫ যিলহজ হুদা বা মধ্যাহ্নে।

মক্কার বাইরে অবস্থান: ৪৮ যিলহজ পর্যন্ত।

মিনা অভিমুখে রওয়ানা: ৮ যিলহজ বৃহস্পতিবার।

মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা: ৪৯ যিলহজ শুক্রবার সূর্যোদয়ের পর।

আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ: ৯ই যিলহজ শুক্রবার সূর্যাস্তের পর। কাসওয়া নামক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে নবীজী এ ভাষণ দান করেন। আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা: ৯ই যিলহজ সূর্যাস্তের পর। মুযদালিফা থেকে মাশআরে হারাম, সেখান থেকে মীনায় রওয়ানা: ১০

যিলহজ সূর্যোদয়ের পূর্বে।

মীনা ভাষণ দান: ১০ জিলহজ মধ্যাহ্নে। ভাষণের পর কুরবানী করেন। কুরবানীর একশ' উষ্ট্রের মধ্যে ৬৩টি নবীজী নিজ হাতে নহর বা কুরবানী করেন। অবশিষ্ট উট নহর করার দায়িত্ব দেন হযরত আলী (রাঃ)কে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করান।

উসামা বাহিণী প্রেরণ :

হযরত উসামার (রাঃ) নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন ১৬ সফর ১১ হিজরী। নবীজীর নির্দেশে প্রেরিত এটা ছিল সর্বশেষ বাহিনী।

নবীজীর অসুস্থতার সূচনা :

১১ হিজরীতে সফর মাসের শেষ দিকে। বর্ণনা থেকে দেখা যায়, নবীজী মোট ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে শেষের ৭ দিন হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় অবস্থান করেন।

শেষ জামাত, শেষ ভাষণ :

মসজিদে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় এবং ভাষণ দান করেন ওফাতের ৫ দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার জোহরের নামাযে। এ সময় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দানের উল্লেখ বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়।

ওফাত :

১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী সোমবার সূর্যোদয়ের পর প্রিয় বন্ধুর ডাকে সারা দিয়ে বিদায় জানান এ ধরাকে।

দাফন :

১০ এবং ১৪ রবিউল আউয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় দেহ মুবারক দাফন করা হয়। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।।

শামায়েলে রাসুল
[নবী চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

নবীজি (সাঃ) এর চরিত্র-মাধুরী

সা'দ ইবনে হিশাম (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন উনার চরিত্র তো হুবহু কুরআন।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কখনো কোন অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চ-স্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন। অতপর কখনো তা আলোচনাও করতেন না।

আম্মাজান (রাঃ) আরও বলেন, একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত দ্বারা কাউকে প্রহার করেননি এবং কোন দাস-দাসী বা স্ত্রীলোককেও প্রহার করেননি।

আম্মাজান (রাঃ) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত। অবশ্য যখন কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত, তখন তাঁর ন্যায় অধিক ক্রোধান্বিত আর কেউ হতো না। তাঁকে যদি দুটি কাজের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণের অনুমতি দেয়া হতো, তবে তিনি সহজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না এটাতে কোন গুনাহ হতো।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি দশ বছর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো 'উহ' (বিরক্তিসূচক) শব্দও করেন নি। কখনো আমার কোন কাজের ব্যাপারে তিনি বলেন নি– এই কাজটি কেন করেছো? বা এমনটি কেন করোনি? তার চরিত্র ছিল সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

বারাআ ইবনে আযেব (রাদি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না।

আলী (রাঃ) বলেন, তিনটি বিষয় থেকে তিনি (সাঃ) দূরে থাকতেন– ঝগড়া-বিবাদ, অহংকার এবং অযথা কথাবর্তা বলা। এবং তিনটি কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতেন– কারো নিন্দা করা, কাউকে অপবাদ দেওয়া এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করা।

তিনি আরও বলেন, নবীজি (সাঃ) অপরিচিত ব্যক্তির দৃঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। কখনো কখনো সাহাবীগণ অপরিচিত লোকদের নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন, কারো কোন প্রয়োজন দেখলে তা সামাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন।

নবীজি (সাঃ) এর দান-বদান্যতা

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করে রমযান মাসে তিনি উদারভাবে দান করতেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাসে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং তাকে পবিত্র কুরআন শুনতেন। যখন তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করতেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি দান খয়রাত করতেন, যেন প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলতেন না।

রুবাইয়্যি বিনতে মু'আওভভিয ইবনে আফরা (রাঃ) বলেন, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু শসা নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এক মুষ্ঠ অলংকার ও স্বর্ণ দান করলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং বিনিময়ও দিতেন।

নবীজি (সাঃ) এর কথাবার্তা ও বাচনভঙ্গি

আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথেও পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কথা বলতেন। আমার সঙ্গেও তিনি কথা বলতেন অনুরূপভাবে। তাতে আমার মনে হতো, আমি সমাজের সর্বোত্তম মানুষ।

হিন্দ ইবনে আবু হালা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা উম্মতের পরকালিন-মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এ কারণে তাঁর স্বস্তি ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময়

নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। আল্লাহর নাম নিয়ে কথা শেষ করতেন। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে কথা বলতেন। তাঁর কথা ছিল একটি থেকে অপরটি পৃথক। তাঁর কথাবার্তা অধিক বিস্তারিত কিংবা অতি সংক্ষিপ্তও ছিল না। তাঁর কথায় ছিল না কঠোরতার ছাপ, থাকত না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব।

আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জোল ও বিনম্র স্বভবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন না, অনুত্তম ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খোঁজে বেড়াতেন না এবং তিনি কৃপণ ছিলেন না। তিনি অপছন্দনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না।

তিনি আরও বলেন, তিনি (সাঃ) কথা বলা শেষ করলে অন্যরা তাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারত। তার কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না। কেউ কোন কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোন কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

তিনি আরও বলেন, কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে নিষেধ করে দিতেন, অথবা মজলিস হতে উঠে যেতেন, যাতে বক্তার (অনর্থক) কথা বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, নবীজি (সাঃ) যে কথায় সওয়াব হয়, শুধু তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের

মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাজ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করি। তিনি এত দীর্ঘ (সময়) কিয়াম করেন যে, আমি একটি মন্দ সংকল্প করে বসি। তাকে বলা হলো আপনি কি করতে চেয়েছিলেন? তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে ছেড়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। একবার তাকে বলা হলো, আপনি এত কষ্ট করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরিয়া আদায়কারী বান্দা হব না?

আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রঃ) এর পিতা বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি সালাত আদায় করছেন। এমতাবস্থায় তাঁর বক্ষদেশ হতে কান্নার এমন শব্দ বের হচ্ছে, যেমন চুলার উপর রাখা পাত্র হতে টগবগ শব্দ শোনা যায়।

উম্মতের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা

আবূ হুরাইরাহ্(রাঃ) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, হে কবরবাসী মু'মিনগণ!

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। (এরপর বললেন) আমার বড় ইচ্ছা হয় যে আমার ভাইদেরকে দেখি। সহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সহাবা। আর আমার ভাই হলো যারা পরবর্তীকালে আসবে, আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের সাথে মিলিত হবো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আগমন করবে, আপনি তাঁদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা চেহারা ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বলেলেন, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন উযূর দরূন তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের আগে গিয়ে অপেক্ষা থাকবো। (মুসলিম,নাসায়ী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে পাঠ করে শুনাব, যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন, আমি তা অপরের কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করি। ফলে আমি সূরা নিসা পাঠ করতে শুরু করলাম। অতঃপর যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম-

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

،(এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে ডাকবো।) তখন আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাড়ালেন। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন করছিলেন এবং দুআ পাঠ করছিলেন, হে আমার রব! তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমার উপস্থিতিতে আমার উম্মতকে শাস্তি দেবে না? আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ যখন ২ রাক'আত সালাত শেষ করলেন, তখন সূর্য বের হয়ে আসল। [বর্ণনাগুলো শামায়েলে তিরমিযি থেকে গৃহীত]

[মহান আল্লাহর অশেষ করুনা ও মেহেরবানিতে অধমের জন্য এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে (সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও) দলিল ভিত্তিক একটি দস্তাবেজ লেখার কাজ পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এতে অধমের যা কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে, তার জন্য মহান রবের কাছে ক্ষমা চাই। এবং সংষোধন করে নেবার তওফিক চাই। অবশেষে মহান রবের নিকট আমার শেষ মিনতি- হে আল্লাহ! আমার এই সংকলনকে গোটা জাতির খিদমতে কবুল করে নিন। আমাদের অন্তরকে তোমার হাবীবের প্রেম দিয়ে সিক্ত করে দিন। **আমীন**।]